শুকতারা

দশম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৬৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন ক'রেছেন বিশ্বের জ্ঞানী গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন সামগ্রী ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তর প্রদেশ ও আসাম

ফোন—ব্যাঙ্ক ৪১১১ পোঃ বক্স—১৫২ তার—নোটপেপার

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950)

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৬৪

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	আকাশ পথে (চিত্র-পরিচয়)	শ্রীনরেন্দ্র দেব	মুখপত্র
২।	খোকন ও কাঠবেরালি (কবিতা)	কল্যাণী প্রামাণিক	৩২৯
৩।	ঘুমের বহর (জানবার কথা)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	৩৩১
৪।	চলো যাই হিমালয়ে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅরুণাংশু চৌধুরী	৩৩৪
৫।	তেমন দেশে ধিক ! (কবিতা)	অতুলকৃষ্ণ সিংহ	৩৪০
৬।	বৈজ্ঞানিক হান্ট (জীবন-কথা)	শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়	৩৪১
৭।	নয়নগড়ের রাজকুমার (রূপকথা)	মুরারিমোহন বিট্	৩৪৫
৮।	বৃষ্টি আসে (কবিতা)	শ্যামলকুমার চক্রবর্ত্তী	৩৫৩
৯।	মিনির বাজীমাৎ (গল্প)	বিষাদবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৪
১০।	ইস্কাবনের টেক্কা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৩৬০
১১।	যার কোনো মানে নাই (কবিতা)	পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৬
১২।	আজব দেশ আমেরিকা	যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার	৩৬৭
১৩।	ইণ্ডিয়ার লোক নয়, ইণ্ডিয়ান তবু (প্রবন্ধ)	প্রবীরকুমার	৩৭১
১৪।	সেকালের নরবলি (ঐতিহাসিক গল্প)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৭৭
১৫।	দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার (হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৮০
১৬।	শকুনি-দেবতা (গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৯০
১৭।	সোনার ভারত (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৩৯৬
১৮।	খেলার আসর (খেলাধূলা)	শ্রীসাংবাদিক	৩৯৯
১৯।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৪০১
২০।	দাদুমণির চিঠি		৪০৪
২১।	গোরাচাঁদ সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা) ···		মুখপত্র ক

পাদপূরণ

জেনে রাখ	সচিত্র	৩৩০
অমর বাণী	স্যর ওয়াল্টার স্কট	৩৩১

পাদপূরণ

জেনে রাখ	সচিত্র
মণিমুক্তা	জি, কে, চেষ্টারটন

অবাক হয়ে শোন (সচিত্র)

কলিকাতা, ৪বি, রাজা কালীকান্ত লেন নিবাসী গোরাচাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ তার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"গোরাচাঁদ সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে এক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

যে কোন বিপ্লব-কাহিনী

গোরাচাঁদ

জন্ম ঃ—২রা আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল।

মৃত্যু ঃ—১৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ সাল।

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। ২। শ্রাবণ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৪। শুকতারা কর্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৬৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৪৲ টাকা দামের বই।

কর্মাধ্যক্ষ, **শুকতারা,** ২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

"শুকতারা"র নিয়মাবলী

১। "শুকতারা"র চাঁদার হার (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২৷৷৹ ও প্রতি সংখ্যা ।৵৹। নমুনা-সংখ্যার জন্য ।৶৹ আনার ডাক-টিকেট বা মণি-অর্ডার যোগে ।৶৹ আনা পাঠাইতে হয়।

২। ফাল্গুন মাস হইতে "শুকতারা"র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া, ফাল্গুন অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। প্রতি মাসে ১লা তারিখের মধ্যেই পত্রিকা Ordinary Post-এ পাঠান হয়। ৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা পত্রিকা না পাওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করাইয়া চিঠি লিখিলে, Certificate of Posting এ পুনরায় পাঠান হয়।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গল্প, কবিতা, ফটো অথবা তাঁহাদের আঁকা ছবিও "শুকতারা"য় প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদাভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ও নকল রাখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৬। ধাঁধার উত্তর ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের অফিসে পৌঁছান দরকার।

"শুকতারা"-বিভাগ
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

সম্পাদক,
"শুকতারা"

এস্. সি. মজুমদার কর্ত্তৃক দেব-প্রেস, ২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ২২।১ বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

আকাশ পথে

আকাশ পথে

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

এক যে ছিল রাজার কুমার ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান উড়ে,
দেশ বিদেশে সুনাম যে তাঁর জয় জয়কার রাজ্য জুড়ে।
একদা সেই ছেলের কাছে খবর এল লোকের মুখে
রাজার মেয়ে কে এক আছে দৈত্যপুরে মনের দুখে।

সুন্দরী সে সবার চেয়ে, গুণের নাকি নেইকো সীমা,
কেউ দেখিনি এমন মেয়ে ; নাম না কি তার মঞ্জুরিমা !
খবর পেয়েই রাজপুত্তুর দুঃসাহসী সকল কাজে
কোথায় সে কোন দৈত্যপুরে গেলেন উড়ে পক্ষীরাজে।

যুদ্ধ সেথা বাধলো তুমুল, রাজার ছেলে লড়েন একা—
নির্ম্মূল সে দৈত্যপুরী, রাজকুমারীর মিললো দেখা !
রাজার মেয়ের বাঁধন খুলে শুধান, তুমি কোথায় যাবে ?
লজ্জা-রাঙা নয়ন তুলে বলেন তিনি এমনি ভাবে—

পথ চেয়ে যে জীবন ভরে তোমার তরেই ছিলাম আমি,
নারীর যে জন রক্ষাকারী রাজকুমারীর তিনিই স্বামী।
হাস্যমুখে রাজার ছেলে ঘোড়ায় তুলে নিলেন তাঁকে,
পক্ষীরাজও হাওয়ার বেগে চললো ছুটে মেঘের ফাঁকে।

শুকতারা

দশম বর্ষ ● পঞ্চম সংখ্যা ● ১৩৬৪, আষাঢ়

খোকন ও কাঠবেরালি

—কল্যাণী প্রামাণিক

দুপুর বেলা বুড়ো অশথ্‌ডালে
কচি কচি পাতার ঝিকিমিকি
আপন মনে ঘুঘু কোথায় ডাকে
চোখে হাসি খোকার ফিকিফিকি।

কাজের শেষে মায়ের চোখে নামে
একটুখানি সব-ভোলানো ঘুম,
কোলের কাছে খোকন করে খেলা,
ছিটিয়ে পড়ে হাসিরই কুম্‌কুম্‌।

ভর দুপুরে খোকার সাথী হ'তে
অশথ্‌বুড়ো পাঠিয়ে দিল কাকে ?
লেজ উঁচিয়ে চুড়ুক্‌ চুড়ুক্‌ ডেকে
ও কে এল ? ডাকবো নাকি মাকে ?

একটি খুদে কাঠবেরালি আমি
ভয় পেও না কিচ্ছু তুমি ভাই,
তোমার সাথে করবো কত খেলা
অশথ্‌মামা পাঠিয়ে দিলো তাই।

বড়ো বড়ো ভয়-ভাঙানো চোখে
বল্‌লে খোকা, বন্ধু তুমি মোর,
চড়বে এসো ছোট কাঠের ঘোড়া,
লাগাম ধরো, ছুটবে কত জোর।

কাঠবেরালি পকেট থেকে নিল
গুটিকত চিনেবাদাম তাজা,
বুক ফুলিয়ে বল্‌লে, ধরো ভাই,
আমি এই গাছতলারই রাজা।

বলি শোনো ভোরবেলাকার কথা,
হাঁসের সারি নামে যখন ঘাটে,
একটা মেঠো ইঁদুর এসে ডেকে
আমায় নিয়ে গেল দূরের মাঠে।

তার ছানাদের জন্মদিনে আজ
বল্‌ব কি সে বিরাট হ'ল ভোজ!
শামুক এল ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি,
কোলা ব্যাঙের বাহারে সাজগোজ!

ও কি! গাছে রোদ গিয়েছে বেঁকে?
বিকেল হোল, ফুরোল মোর ছুটি,
হাতে আমার কত যে কাজ আছে,
চুমো দিয়ে তোমায় এবার উঠি।

খোকন বলে, আবার এসো তুমি
উঠোনকোণে খেলবো কত মোরা,
কত মজার গল্প বলো তুমি,
শুন্‌বো আমি আর কাঠেরি ঘোড়া॥

● জেনে রাখ

১নং চিত্র। বাষ্পীয় শক্তিতে চলে রেলগাড়ী আর পেট্রোলে মোটর গাড়ী চলে। বিদ্যুৎও শক্তি। বিদ্যুৎ[illegible] কারখানাও চলে; রেলগাড়ীও চলে। কিছু চালাতে হলে শক্তির প্রয়োজন। আমরা বেঁচে আছি শক্তির সাহায্যে। [illegible] আমাদের হৃদয়কে চালায়। তারি ফলে ফুস্‌ফুস্, উদর প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের কলকব্জা চলতে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু [illegible] এই দৈহিক যন্ত্র চালাতে সাধারণ জীবনে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, সেই সমস্ত শক্তি একত্র করে একটি বড় ভারী যুদ্ধের জাহাজ[illegible] জল থেকে চৌদ্দ ফুট ওপরে তুলে ফেলা যায়।

২নং চিত্র। পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে গুপ্তচরকে ঘৃণা করে না। তাই ধরা পড়লে গুপ্তচরের [illegible] মৃত্যু। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা, এই সব ঘৃণ্য কাজ করতে কোন দেশ সঙ্কুচিত হয় না। এই রকম এক গুপ্ত[illegible] সুইটজারল্যাণ্ডে ধরা পড়ে। গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপ সব জেনে, সুইটজারল্যাণ্ড সরকার দলটি ভাঙ্গবার নির্দ্দেশ দেন।

৩নং চিত্র। বুধাপেষ্টের চার্চ্চকে ভেঙ্গে সেখানে ষ্টালিনের এক বিশাল মূর্ত্তি স্থাপনা করা হয়েছিল। [illegible] হাঙ্গেরী-স্বাধীনতা আন্দোলনে মূর্ত্তিটি ভূমিসাৎ হয়েছে। ধর্ম্ম মানুষের আত্মম্ভরিতা সহ্য করে না।

ঘুমের বহর

—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

ঘুমের কোন প্রতিযোগিতা আছে কিনা কোথায়ও জানি না ; কিন্তু যদি থাকে, তাহ'লে কেবল মানুষ নয়—বাঘ-ভালুক, সাপ-ব্যাং অনেকেই এসে সে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

যা' হ'ক ঘুম যে কেবল বিছানায় শুয়েই হয় তা' নয়। ঘুম হেঁটে, দাঁড়িয়ে, ব'সে, শুয়ে সব রকমেই হ'তে পারে—অবশ্য সেজন্যে অভ্যাস চাই।

পিসেমশায়ের কাছে গল্প শুনেছি, তাঁর কোন এক আত্মীয় বাঁড়ুয্যেমশায় তাঁদের গ্রাম থেকে যশোর যেতেন মামলা করতে। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন দেশে এত রেল-ষ্টীমার, গাড়ী-ঘোড়া ছিল না। যশোর তাঁদের গ্রাম থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূর। ওরা রাত থাকতে রওনা দিয়ে বেলা দশটায় আদালতে পৌঁছতেন।

পিসেমশায় পিছনে আর বাঁড়ুয্যেমশায় চলেছেন আগে আগে—হুঁকো টানতে টানতে। বাঁড়ুয্যেমশায় পথ চলছেন, হুঁকো টানছেন আর মাঝে মাঝে সঙ্গীদের কথাতেও সায় দিচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল বাঁড়ুয্যেমশায় আর না-হুঁ কিছুই বলছেন না, হুঁকোও টানছেন না। পিসেমশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয্যেমশায় বুঝি মোকদ্দমার কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে পথ চলছেন। অনেকক্ষণ পরে লক্ষীপুরের খালের কাছাকাছি এসে পিসেমশায় জিজ্ঞাসা করলেন বাঁড়ুয্যেমশায়কে : খাল পার হওয়ার কি হবে? গামছা পরতে হবে নাকি—না, বাঁশের সাঁকোটাকো কিছু করেছে ?

বাঁড়ুয্যেমশায়ের এবারও কোন উত্তর নেই!

পিসেমশায় এবার বাঁড়ুয্যেমশায়ের গায়ে একটা নাড়া দিয়ে বললেন : শুনছেন—

আচমকা ঘুম থেকে উঠলে লোকের যেমন হয় তেমনি ভাবে বাঁড়ুয্যেমশায় বললেন : এঁ্যা!

লক্ষীপুরের খাল পার হওয়ার কি ব্যবস্থা আছে ?

বাঁড়ুয্যেমশায় চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বললেন ঃ এলাম নাকি লক্ষ্মীপুর ?

দাঁড়িয়ে ঘুমোয় কারা জান ?—ঘোড়া। শুনেছি, কখনও কখনও পুলিশেও নাকি ওভাবে ঘুমোয় ! ব'সে ব'সে কারা ঘুমোয় সে কথা আর খুলে আমি বলব না তোমরা নিজেরাই তা' জান। তা' ছাড়া অফিসের বৃদ্ধ কেরাণী, আফিংখোর, ট্রেনের যাত্রী এরাও ব'সে ব'সে ঘুমাতে পারে। আচ্ছা, ট্রাফিক পুলিশ হাত উঁচু করে অথবা মোটর গাড়ীর ড্রাইভার যদি ষ্টীয়ারিং ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ?—কি সর্ব্বনাশ, এ কথা ভাবতেও যে বুক কেঁপে ওঠে !

যখন খুশী এবং যেখানে সেখানে নিদ্রা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্যেরই' 'সাধ্য' আছে তা' নয়। মুটে-মজুর, ভিখারী এরাও যেখানে সেখানে ঘুম দিতে অভ্যস্ত।

খাবারের দোকানের একটি ছেলের কথা আমি জানি। সে সকালে আমাদের বাড়ীতে কি কাজে এসে আর ফিরে যায়নি দোকানে। খোঁজ নিতে এল দোকানী —সাধন গেল কোথায় ? খোঁজ, খোঁজ কোথায় গেল সাধন। অবশেষে দেখা গেল, আমাদের পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়তে উঠে সাধন ঘুমিয়ে পড়েছে ডালের উপর বসেই ! খাবারের দোকানে ওদের প্রায় সারারাতই কাজ করতে হয় ; কাজেই ভোরের বাতাস পেয়ে গাছে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে সে !

কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়। কিন্তু বাঘের চেয়েও ভালুকের ঘুমের বহর আরও বেশি। যদিও ঘুমটা এদের নিয়মিত নয় তবু এরা একাদিক্রমে প্রায় মাস তিনেক ঘুমাতে পারে।

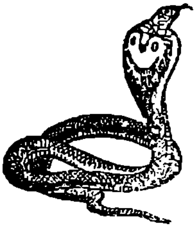
সাপ

সাপ-ব্যাং শীতকালে কাবু হ'য়ে পড়ে খুব। সাপ কোনও গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মরার মত পড়ে থাকে। শীতকালে ব্যাং গর্ত্তে ব'সে সাধনা করে—সেকি যে সে সাধনা, একেবারে কৃচ্ছ্র সাধনা! সারাটা শীতকাল ব্যাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে গর্ত্তে ব'সে থাকে। প্রাণীবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, ব্যাং তার চামড়া দিয়ে নাকি নিঃশ্বাস নেয় এই সময়।

ব্যাং

শামুকের সাধনাও কম নয় ; শীতকালে শামুক তার কঠিন আবরণের মধ্যে ঢুকে চুপচাপ পড়ে থাকে।

মাছের মধ্যে কই, মাগুর ও পাঁকাল মাছ শীতকালে ঢুকে পড়ে পাঁক বা গর্ত্তের মধ্যে। গরমকালে অনেক সময় শুকনো খানা-ডোবা খুঁড়লে কই-মাগুর পাওয়া যায়।

শীতকালে ঘুমের প্রতিযোগিতায় কাছিমের সঙ্গে বোধহয় পেরে উঠবে না কেউ। শীতের আভাস পেয়েই কাছিম ঢুকে পড়ে পাঁকের মধ্যে। তারপর খাল বিল সব শুকিয়ে যায়, চাষী লাঙ্গল নিয়ে যায় চাষ করতে—তখন- লাঙ্গলের ফলায় উঠে পড়ে কাছিম!

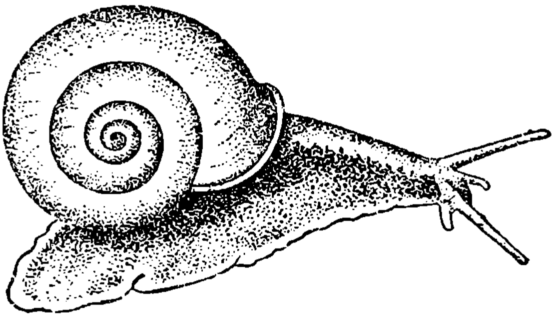

শামুক

হাঁ, মৌমাছি-বোলতা এরাও ঘুমায় শীতকালে। পিঁপড়েরাও গর্ত্তে ঢোকে। বোলতা এসে আমাদের ভাঁজ-করা লেপের মধ্যে আশ্রয় নেয় কার্ত্তিক মাসের ওদিকেই।

তারপর পৌষ মাসে আমরা যখন সেই লেপ নামিয়ে রৌদ্রে দিতে যাই, তখন দেখা যায় বোলতা দলা পাকিয়ে আছে সেই লেপের ভাঁজে ভাঁজে। এই জন্যে অনেকে লেপ তুলে রাখার সময় একটা ঢাকনা জড়িয়ে রাখেন।

মশা, মাকড়শাও গ্রীষ্মকালে ঘুম দেয়; কিন্তু এক রকমের কাঠ-পোকা আছে তাদের শীতের ঘুম সাংঘাতিক। এদের দীর্ঘ নিদ্রা একেবারে চির-নিদ্রায় পরিণত হয়। এই পোকাগুলি গোলাপের পাতা কাটে। শীত পড়লে এরা কোনও কাঠের গুঁড়ির মধ্যে গর্ত্ত করে তার মধ্যে গোলাপের পাতার কুণ্ডলী করে। অবশেষে নিজের মুখের লালা দিয়ে তার গর্ত্তের মুখটাও বন্ধ করে। মাস কয়েক পরে যখন তার ঘুম ভাঙ্গে তখন আর তার বেরিয়ে আসবার সামর্থ্য থাকে না।

● অমর বাণী

স্বদেশপ্রেমিকের ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, ভীরুর ধর্ম্ম নয়। হয়ত গৃহলক্ষ্মীর আহ্বান তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিমনা করবে। হয়ত পুরোনো স্মৃতির মায়া তোমাকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু জীবনে প্রতি পদে যারা ভয়ে ভয়ে, ছোট ছোট বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে নিজেদের বেঁধে রেখে গুটি গুটি এগিয়ে যায়, তাদের মতো তোমাকে অচেনা অজানা অখ্যাতির বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে না। আগামী দিনের পৃথিবী তোমাকে জানাবে সত্যিকারের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য। হে বিদ্রোহী বীর, এগিয়ে চল!

—স্যর ওয়াল্টার স্কট

চলো যাই হিমালয়ে

—শ্রীঅরুণাংশু চৌধুরী

গ্রীষ্মের ছুটী হ'য়ে গেল। এবারের ছুটীতে ঠিক হোলো আমরা "দেরাদুন" যাব। তারপর সেখান থেকে মুসৌরী, হরিদ্বার, লছমনঝুলা, দেবপ্রয়াগ যাওয়া হবে। আমার আনন্দ আর ধরে না। মা বাবা আর আমি যথাসময়ে জিনিসপত্র নিয়ে হাওড়ায় এসে পৌঁছালাম।

ট্রেণ প্ল্যাটফর্মে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীরা পুঁটুলি মাথায় নিয়ে সারা প্ল্যাটফর্ম পাগলের মত ছুটোছুটী করতে লাগলো, আর জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকতে লাগলো। দরজা দিয়ে ঢোকবার চেয়ে জানালা দিয়ে গাড়ীতে ঢুকতে তাদের বেশী আগ্রহ কেন, তা' আমি বুঝতে পারলাম না।

আমাদের সিট্ রিজার্ভ করা ছিল। কাজেই আমাদের কোন অসুবিধা হোলো না। সেদিন আর কেউ সিট্ রিজার্ভ করেন নি ব'লে আমরা পুরো কামরাটাই পেলাম।

মায়ের আবার যত ভয়। মা বলতে লাগলেন—"সারা রাত একলা যেতে তো ভয় করে বাপু।" এমন সময় এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—"আপনারা তো একলা যাচ্ছেন, আপত্তি না থাকে তো আমরা আপনাদের কামরায় উঠি।"

তাঁরা যাবেন বেনারস। হাওড়া বড়বাজারের কাছে গুপ্ত ব্রাদার্স দোকানটা তাঁদের। মা তো সঙ্গীই চাইছিলেন, কাজেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন, আসুন। কিছু আপত্তি নেই।" রাত ৯টা নাগাদ ট্রেণ ছেড়ে দিল। ট্রেণ ছাড়তেই তো আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে ব'সে পড়লাম। বাবা বললেন—"এই বোকা এখন খাচ্ছিস্। আমি কিন্তু বর্দ্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা কিনে খাবো।"

যাক্ ট্রেণ প্রথমে শ্রীরামপুরে এসে থামলো। ২।৩ মিনিট থেমে আবার চললো। এর মধ্যে আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে ও আর একজন মহিলা মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মা যা ভুল হিন্দী বলেন, আমার খুব হাসি পায়।

রাত্রি গভীর হতে গাড়ীতে সবাই বিছানা পেতে আরাম করে শুলেন, বাবা শুধু বসে বসে ঢুলছেন। বাবা গাড়ীতে বড্ড জেগে পাহারা দেন! আমি রাত ৩টা পর্য্যন্ত জেগেছিলাম। তারপর মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা বাবা আমাকে ওঠালেন,—"বিবু, টানেল দেখবি ওঠ।"

আমি চোখ মুছতে মুছতে উঠে দেখলাম আলো অন্ধকারে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত 'গুঝণ্ডি' পাহাড়, আর কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখলাম ওমা, আমরা সেই দৈত্য পাহাড়ের পেটের মধ্যে ঢুকে আবার বেরিয়ে পড়েছি। পাহাড়ের ভেতর গর্ত্ত ক'রে তার ভেতর দিয়ে রেল যায়, সেইগুলিই নাকি "টানেল"। কি ভূতুড়ে অন্ধকার তার ভেতর। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেঞ্চে এসে বসতেই ট্রেণ গয়া এসে পৌছালো। মাঠের ওপর দিয়ে লোকেরা ঘটি নিয়ে দাঁতন করতে করতে চলেছে।

ত্বপুরে গাড়ী বেনারস এসে থামলো। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোকরা বেনারসে তাঁদের বাড়ীতে থেকে, বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে যেতে অনুরোধ জানালেন এবং নেমে যাবার সময় তাঁদের জলের কুঁজোটি আমাদের দিয়ে গেলেন, কেন না আমাদের জলের অ্যালুমিনিয়ামের জায়গায় নাকি জল খুব গরম হয়ে যাবে। তখন কেল্‌নার থেকে আমাদের খাবার দিয়ে গেল। কেল্‌নারের লোকটা খাবার সময় ব'লে গেল, জানালা বন্ধ না রাখলে বাঁদর এসে খাবার কেড়ে নেবে। খাওয়ার পর আমাদের যে কি গরম লাগলো, তা' আর বলতে পারি না। প্রায় সেদ্ধ হ'য়ে গেলাম—ঘুম আর আসে না। পশ্চিমে তখন 'লু' বইছে। গরমে ছট্‌ফট্ করছি আর বাইরের দিকে দেখছি। এখানে শুধু শুকনো মাঠ যেন ফুটিফাটা হয়ে আছে। দেখবার কিছু নেই। সবুজ বাংলাদেশ ছেড়ে কি কাঠখোট্টা দেশে এলাম!

গাড়ী অযোধ্যায় দাঁড়ালো। একি অযোধ্যা? অযোধ্যার ষ্টেশন দেখে কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যার কথা মনে হোলো, আর বুঝলাম সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। তারপর আবার ট্রেণ চলেছে তো চলেছেই। সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্ণৌ এসে পৌছালাম।

এখানে ষ্টেশনে যা পুরী বিক্রী হচ্ছিল, এত মোটা পুরী আমি জীবনে দেখিনি। তাই মাত্র একটি কিনে আমি খেলাম। ট্রেণ ছেড়ে দিল কিন্তু গরমে যে কি কষ্টই পাচ্ছি। গাড়ীতে এখন বেশ ভীড় হয়ে পড়েছে। সে-রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ভোরে আমরা হরিদ্বার পৌছালাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। এখানেও টানেল পার হ'য়েই গেলাম। যে পাহাড়ের টানেল সেটা শিভালিক রেঞ্জের শেষ। হিমালয় আরম্ভ হবে এইবার। হরদ্বারের হরের দ্বারে এসে পৌছালাম। হরিদ্বার ছেড়ে সকাল ৯টা নাগাদ ট্রেণ দেরাদুন এলো।

ট্রেণ থেকে নেমে দেখি আমার সুমনাদাদা আমাদের নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর একটা টাঙ্গা করে দেরাদুন ফরেষ্ট অফিসে সুমনাদাদার কোয়ার্টার্সে পৌছালাম। দেরাদুন ফরেষ্ট অফিস প্রায় তিন বর্গ মাইল জুড়ে—মাঝে মাঝে চমৎকার চওড়া রাস্তা। আর কোথাও পাইন গাছের বন—গাছের নীচে যেন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা আছে—ওপরে ঘন পাতার সমারোহ। ভারী সুন্দরভাবে গাছপালাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে একটি মিউজিয়ম ও একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখলাম। তার পরদিন আমরা রবার্ট কেভে গেলাম। সেই গুহার মধ্য দিয়ে কোথাও ১ হাত কোথাও আধ হাত গভীর একটি পাহাড়ে নদী প্রায় ১ মাইল বয়ে গেছে।

সেই জলের ভেতর দিয়ে আমরা পাঁচজন বাবা, মা, সুমনাদাদা, সুজিতদা ও আমি যেতে লাগলাম। সুমনাদাদা বললেন—"সাবধানে যাও, পাথর খুব পেছল, পড়ে যাবে।" ঠিক তখুনি আমি পড়ে গেলাম, জামা প্যাণ্ট ভিজে গেল। মা বকবক্ করতে লাগলেন। তারপর সেই গুহার মাঝে একটি ছোট জলপ্রপাতের পাশে আমরা বসে চায়ের সরঞ্জাম বার করতে লাগলাম।

কেট্‌লিতে চায়ের জল ফুটছে, এমন সময় খোঁজ পড়লো চিনি কোথায়? দেখা গেল সব এসেছে কেবল চিনি আসেনি। শেষে পাঁউরুটী আর 'চিজ' নিয়ে খেতে বসলাম। এক কামড় দিয়েই সকলেই বুঝলাম 'চিজ'টা কি চিজ। সামনেই একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে বসে ছিল, তাকে সব দিয়ে দেওয়া হোলো। সে আনন্দে লেজ নেড়ে খেতে লাগলো। তারপর চিজ খেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে সে আমাদের সঙ্গে জলের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলো। আমরা পাঁচজন যেন মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চ পাণ্ডব, আর কুকুরটা আমাদের সঙ্গী। গুহার মধ্যে কোথাও অন্ধকার, কোথাও বা পাহাড় মাথার ওপর থেকে সরে গিয়ে আলো ঢুকছে। মা সুবিধে পেলেই 'ক্লিক্' করে ফোটো তুলছেন।

গুহার মধ্যে সাধু

আমাদের পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। ঝর্ণার ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল, পাহাড়ের ওপর ফুটো হয়ে মাঝে মাঝে ঝর ঝর করে পড়ছে, আর আমরা তাই খেয়ে পেট ভরাচ্ছি। গুহা শেষ হোলো, আমরা ওপরের আলোর রাজ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সুমনাদাদা বলেছিলেন, ওর নাম রবার্ট কেভ কেন হয়েছে। একবার গাড়োয়ালীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়, তখন গাড়োয়ালীরা ঐ গুহার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতো। ইংরেজরা কিছুতেই তাদের না হারাতে পারায় তাদের সেনাপতি রবার্ট একটা উপায় অবলম্বন করলেন। ওপরের নদীর জলে বিষ মিশিয়ে দিতে লাগলেন! তখন গুহার ভেতরের সৈন্যরা সেই বিষ-মেশানো জল খেয়ে মরে যেতে লাগলো এবং বেরিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোলো। গুহাটা জয় করেছিলেন বলে, তাঁরই নামানুসারে গুহাটার নামকরণ করা হয়েছে 'রবার্ট কেভ'।

পরদিন ঠিক হোলো আমরা টপ্‌কেশ্বর যাবো। চমৎকার জায়গা—দুধারে পাহাড়, মাঝে শীর্ণ এক নদী বয়ে যাচ্ছে। সেখানে একজন সাধু সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন—একটি শিবলিঙ্গের মাথায় বছরের পর বছর টপ্ টপ্ করে সাদা দুধের মত জল পড়ছে। এর জন্যেই তো তাঁর নাম টপ্‌কেশ্বর। বাবা বললেন, জলে ক্যালসিয়াম মেশানো আছে।

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে কতদূর গুহার মধ্যে ঢুকলাম। দূরে মিট্‌মিট্ করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ সুমনাদাদা কি দেখে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সরে এলেন—কি রে বাবা বাঘ নাকি ?

আমাদের সঙ্গী সাধু বললেন—"কোই বিল্লি হোগা।" তিনি বললেন—"এই মন্দিরে প্রথম যিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি এক বাঙ্গালী সাধুই ছিলেন। এই নির্জ্জনে একা বসে তপস্যা করতেন। আপনার মত ভীরু বাঙ্গালী ছিলেন না যে বিল্লী দেখে ডর লাগে।"

সুমনাদাদা ও আমরা মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলাম। তারপর দেখি, কতকগুলো গুহার মুখে এক টুক্‌রো ক'রে গেরুয়া রংয়ের কাপড় ঝুলছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—"ওগুলো পাহাড়ের মাঝে মাঝে কেন রয়েছে ?" তখন সেই সাধু বললেন—"এক একটা কাপড় দেওয়া গুহায় এক একজন সাধু থাকেন! ওগুলো দেওয়ার কারণ, কোন ভক্ত গৃহস্থ লোক রোজ এসে সাধুদের জন্যে হয়তো একটি করে রুটী রেখে যান। সাধুরা তাই খেয়ে প্রাণে বেঁচে থেকে তপস্যা করেন। আমরা একটি সাধুর গুহা দেখলাম। গুহা থেকে একটি লোহার শিকল ঝোলানো আছে। গুহাতে যেতে গেলে সেইটি ধরে উঠতে হবে। আমাদের ওঠার সাধ্যই নেই। এই সাধু নাকি ৬০ বছর ধরে মৌনী অবস্থায় তপস্যা করছেন; গুহা থেকে খুব কম বেরোন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন বেরিয়েছিলেন।

আমরা এদিক্-ওদিক্ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তার ওপর একটা বড় পাথর পড়ে আছে; সেই পাথরের ওপর সেই সাধু শুধু কৌপীন পরে, একটা যৌগিক আসনে বসে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চোখের পলক পড়ছে না—নড়াচড়া একেবারে নেই, পাথরের মত নিশ্চল। সামনে গিয়ে দেখি, তাঁর নাকের ফুটোর মধ্যে দুটো মোটা চুরুটের মত কি গুঁজে দিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছেন। খুব অদ্ভুত লাগলো। মা তাঁর চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলেন, যদি সাধুবাবা একটিবার ডাকেন তো পায়ে লুটিয়ে পড়েন এই ভাব! ক্যামেরায় ফোটোও নিতে পারছেন না যদি রেগে গিয়ে শাপ দিয়ে বসেন! এইরকম সামনে দিয়ে কয়েকবার আনাগোনা করাতে ওঁর বোধ হয় অসুবিধে হোলো, উনি চোখ বুজলেন। আমরা মনে মনে নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম। শুনলাম ঐ একই অবস্থায় বসে উনি নাকি তিন চার দিন কাটিয়ে তবে গুহায় উঠে আসবেন। টপ্‌কেশ্বরের এই সাধুর স্মৃতি আমাদের এখনো মনে তৃপ্তি দেয়।

পরদিন মুসৌরী যাবার পালা। আমরা সকালে দেরাদুন থেকে বাসে করে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলাম। অনেকে রাজপুর থেকে চড়াইয়ে উঠতে বাসে বমি করে ফেললো। দূর থেকে দেরাদুন উপত্যকাটি দেখতে খুব ভাল লাগছিল। ১০টা নাগাদ যেখানে বাস থামলো—সেটাকে লাইব্রেরী বাজার বলে। আমরা নেমে একজন গাড়োয়ালী গাইডকে সঙ্গে নিয়ে চারদিকে ঘুরলাম। কিছুদূর গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে আমরা গায়ে কোট চাপালাম। আরও পাহাড়ে চড়তে দেখি,

আমাদের পায়ের তলায় মেঘ, সামনে দিয়ে খানিকটা মেঘ আসছে—আমি হাঁ করে রইলাম, খানিকটা মেঘ আমার পেটের মধ্যে চলে গেল।

তারপর আমরা চলেছি, একপাশে উঁচু পাহাড়, ছবির মত বাড়ীগুলি। চমৎকার ফুল ফুটেছে, একপাশে গভীর খাদ আর মাঝে মাঝে বন। আমরা 'ম্যাল'এ গেলাম ও লালটিপ্পায় উঠলাম। টিপ্পার মাথার ওপর উঠতে একটু বাকী ছিল, এমন সময় বাবা সাবধান করে দিলেন যেন পা পিছলে না পড়ে যাই। আমাদের গাইড গোপাল সিং রাস্তা সর্টকাট করার জন্যে বনের ভেতর খুব সরু রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলছিল। কিন্তু আমি আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলাম—গাইডটা ভাগ্যিস্ ধরে ফেলেছিল, নইলে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট নীচে পড়ে ছাতু হয়ে যেতাম।

লালটিপ্পার একদম মাথায় একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে—সমস্ত শহরে জল সরবরাহ হয়। শীতকালে সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে যায়। বাড়ীঘর সব বরফে ঢাকা পড়ে যায়, সেজন্যে শীতকালে সেখানে কেউ থাকে না। ওপরে আবার একটি ছোট সুন্দর ফুলের বাগানও আছে। পার্কের মত, বেশ অনেক লোক বেড়াতে এসেছেন। নীচে আশে পাশে বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠছে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, যেন মায়াপুরী। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নাকি কেদারবদরীনাথ পাহাড়ও দেখা যায়। গাইডটার আমাদের ওপর মায়া হয়ে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করলো—"বাবু আবার কবে আসবেন? আমাকে আবার সঙ্গে নেবেন তো?"

মা যে সব ফোটো তুলেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটাতে গোপাল সিং ছিল। ও সেগুলি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানালো। তারপর আমরা পাহাড় থেকে নেমে দেরাদুনে চলে এলাম। দেরাদুনে এসে ফরেষ্ট অফিস থেকে মুসৌরী পাহাড়ের আলোগুলো দেখতাম। মনে হোতো একমুখ হেসে মুসৌরী আমাদের হাতছানি দিয়ে আবার যেতে ডাকছে। বড্ড কম সময় ছিলাম কিনা মুসৌরীতে।

এবার হৃষীকেশ, হরিদ্বার, লছমনঝুলা ও দেবপ্রয়াগ যাবার পালা। দেরাদুন থেকে বাসে হরিদ্বার গেলাম। হরিদ্বারের গঙ্গার জল কি স্বচ্ছ আর ঠাণ্ডা। আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলাম কি স্রোত। সবাই শেকল ধরে নাইছে। আমরা সারাদিন একটা গাড়ী করে হরিদ্বারে কনখল ও অন্যান্য যা' দেখবার দেখে নিলাম। পরদিন লছমনঝুলা গেলাম। গঙ্গা পার হবার জন্যে আগে দড়ির ঝোলা বা পুল ছিল, এখন এমনি পুলই আছে, তবে তার ওপর দিয়ে গেলে কিন্তু পুলটা দোলে। সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে সারি সারি প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছেন যাত্রীরা। নদীর ঢেউয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ দুলতে দুলতে, আর কত প্রদীপের ছায়া জলে ফেলে গঙ্গার জলকে পরীর মেয়ের জরির চিক্‌মিকে শাড়ীর মত করে দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে 'গীতা ভবন' বলে একটা বাড়ী দেখলাম। তার সমস্ত দেয়ালে গোটা গীতাটা লেখা আছে। সেখান থেকে আমরা হৃষীকেশে এলাম। সে রাত্রিটা থেকে পরদিন সকালে দেবপ্রয়াগের বাসে চড়ে বসলাম। কিছুটা যাবার পর একটা জায়গায় বাস থামিয়ে সবাইকে টিকে দিতে লাগলো। যারা দিতে চায় না, তাদের ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে হয়।

তারপর বাস ছাড়লো। একদিকে খাড়া পাহাড়, অপর দিকে গভীর খাদ। যে রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে তা' খুব সঙ্কীর্ণ আর খালি বেঁকে যাচ্ছে। হাজার ফুট নীচে কলনাদিনী গঙ্গা। গঙ্গার এমন রূপ আগে আমরা দেখিনি। বড় বড় পাথরে আছড়ে দুষ্টু মেয়ের মত জল ছুটছে। ভয়ানক শব্দ—শুনে প্রথম উঠতেই আমাদের কাণে তালা লেগে গিয়েছিল। এত সুন্দর দৃশ্য, সে না দেখলে কল্পনা করা যায় না।

রামধনু উঠেছে, ঠিক যেন গঙ্গার বুক থেকে উঠে এসেছে। আর এত কাছে, হাত দিয়ে ধরা যায় যেন! মাঝ রাস্তায় 'ব্যাস-ঘাট' বলে একটা জায়গায় বাস দাঁড়ালো। বাসের লোকেরা মাছি ভন্ ভন্ করা খাবার কিনে গোগ্রাসে গিলছে। আমরা না খেয়েই ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম।

চারপাশে মৌনী যোগী তপস্বীর মত পাহাড় কত যুগের সাক্ষী হ'য়ে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে! হাত তুলে নমস্কার করতে ইচ্ছে করে। তারপর আমরা দেবপ্রয়াগ এসে পৌছালাম। এখানে ভাগীরথী আর অলকানন্দা এসে মিশেছে। দুটার জলের রং দুরকম। গঙ্গার জল ঘোলা, কিন্তু অলকানন্দার পরিষ্কার জল। আমরা ধর্ম্মশালায় উঠে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ডাল ভাত আর আলুর তরকারী। ঘি-এ রান্না হোলো—সর্ষের তেল পাওয়া যায় না। সেখানে চারিদিকে খানিক ঘুরে, আমরা ফিরে এলাম বাসষ্ট্যাণ্ডে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস ফিরছে কেদারবদরী ফেরত যাত্রীদের নিয়ে। আমরা কোনরকমে তারই একটায় উঠে বসলাম। তারপর ফিরে এলাম হরিদ্বার। সেখান থেকে দেরাদুন ফেরত এলাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল, নইলে আমাদের এত ভাল লেগেছিল যে, সময় থাকলে আমরা কেদারবদরী পর্য্যন্ত চলে যেতাম। এজন্যে আমাদের মনটা বড় অতৃপ্ত হ'য়ে রইলো।

দেরাদুনে ফিরে এসে কলকাতা ফেরবার জন্যে তোড়জোড় হ'তে লাগলো। সেখানে একটি ছোট্ট পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে খেলা করতাম। একটা মস্ত বড় লোহার গেট ছিল, সেই গেটে উঠে ঠেলা দিয়ে আমরা গাড়ী গাড়ী খেলতাম।

হঠাৎ একদিন সেই গেটটা ভেঙ্গে আমার ওপর পড়ে গেল! এত লেগেছিল, যে আমি কোন কথা বলতে পারিনি। সেই ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু কোনরকমে অত ভারী গেটের একটু কোণ কি করে উঁচু করে চীৎকার করেছিল তা' ভগবানই জানেন। নইলে সে যাত্রা আমার হাত-পা ভেঙ্গে একটা কাণ্ডই হোতো। আমাদের বেয়ারা আর কয়েকজন লোক গেট থেকে আমাকে বের করে কোলে করে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

ট্রেণে আমাকে শুইয়ে নিয়ে আসা হোলো। এবার গাড়ীতে ছিল অসম্ভব ভীড়। আর পথে ফৈজাবাদে ঠিক একদল সৈন্যসামন্তের মত প্রায় ৩০ জন লোক কমপক্ষে ৬০টা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ভয়ানক গোলমাল করতে করতে আমাদের গাড়ীতে উঠলো। সঙ্গে তাদের একটি ছোট ছেলে—তার নাম 'ঝুল্লুয়া' ও তার ছোট্ট বেনারসীর পুঁটুলির মত নতুন বৌ। ওরা ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছে কলকাতা। ওদের সঙ্গে ছিল লাড্ডুর হাঁড়ি। সারা রাস্তা ঝুল্লুয়ার ভীষণ মোটা বাবা আমাদের গাড়ীর সবাইকে লাড্ডু আর মেঠাই খাওয়াতে লাগলেন। কাজেই আমরা হাসিমুখেই তাদের এই অত্যাচার সহ্য করলাম। হাওড়ায় এসে সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমরা উর্দ্ধশ্বাসে পাশের প্লাটফর্ম্মে দৌড়ে এসে আবার কোন্নগরের লোক্যাল ট্রেণে উঠে বসলাম। গ্রামের সব চেনা তাল নারকেল গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে—অনেকদিন পরে ফিরছি বলে, আদর করে ঘরে ডেকে নিচ্ছে—আয়, আয়, আয়।

তেমন দেশে ধিক !

—অতুলকৃষ্ণ

চাইনা হ'তে এমন দেশের তরুণ নাগরিক ;
যেথায় দুখীর ব্যথার রোলে মুখর চারিদিক।
কারও আছে ধনের পাহাড়,
কারও মুখে নেইকো আহার ;
কেউ বা থাকে রাজপ্রাসাদে, কেউ বা মাগে ভিখ্।

কেউ বা ধনের গর্ব্বে ভরা, চায় না দুখীর পানে।
অকিঞ্চনের দিন কেটে যায়, ব্যথায় অপমানে।
নেইকো প্রাণের সহজ প্রীতি,
আছে কেবল শাসন-ভীতি ;
অত্যাচারী শঙ্কাবিহীন, দরদ নাইকো প্রাণে।

জ্ঞানের আলো যেথায় জ্বলে গুটি কয়েক ঘরে।
ক্ষেতে যারা ফসল ফলায়, অনাহারেই মরে।
সবার উপর মানুষ সত্য—
মানে না এই পরম তত্ত্ব।
রাষ্ট্র-শাসনদণ্ড আছে স্বেচ্ছাচারীর করে।

চাইনা হ'তে এমন দেশের তরুণ নাগরিক ;
দেশের ডাকে জীবন দিতে নেইকো সাহসিক।
ন্যায় বিচারের কণ্ঠ রুদ্ধ,
স্বার্থে-স্বার্থে সদাই যুদ্ধ।
শুচি-অশুচির বিভেদ যেথা, তেমন দেশে ধিক্ !

বৈজ্ঞানিক হাণ্ট

—শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শীতের সকাল।

একজন পথচারী অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ দিয়ে চলেছেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি তাঁর খুব কাছে এসে গেছে—সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপই নেই। লোকটি চাপা যায় দেখে, রাস্তার সকল লোক হৈ-হৈ করে উঠলো······ঘোড়ার গাড়ির চালক প্রাণপণে ঘোড়ার লাগাম কষতে কষতে পথচারীটিকে সরে যেতে নির্দ্দেশ দিতে লাগলো।

এত লোকের মিলিত চীৎকারে তাঁর চমক ভাঙে। তিনি লক্ষ্য করলেন, আর একটুর জন্যে তিনি ঘোড়ার গাড়ির চাকায় চাপা পড়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন! কেউ বা ভগবানকে সেজন্যে ধন্যবাদ দেয়, কেউ বা অন্যমনস্কভাবে পথ চলার জন্যে সতর্কতার কথা বলেন। ঘোড়ার গাড়ির চালক কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যায়।

কিন্তু পথচারীটির এসব কোনদিকেই মন ছিল না। তিনি তখন ভাবছিলেন, কেমন করে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়? ছুটলেন তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে। সামান্য চিন্তার পর তিনি আবিষ্কার করেন এক রকমের ঘণ্টা—যা' আজও প্রতিটি ঘোড়ার গাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়।

এই অন্যমনস্ক পথচারীটি কে জান? ইনি হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম—ওয়ালটার হাণ্ট।

ওয়ালটার হাণ্টের জীবনী গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। অভাবের তাড়নায় তিনি আবিষ্কার করেছেন আজকের বহু আবশ্যক জিনিস, যা' আজও অপরিবর্ত্তিত বা সামান্য পরিবর্ত্তিত হয়ে সভ্য সমাজে চলছে। কিন্তু তাঁর নাম ক'জনেই বা জানে?

এই প্রতিভাবান্ আবিষ্কারক ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ও বাবা কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। নিউইয়র্কের মার্টিন্স্বার্গে ছিল তাঁদের বাড়ি। সেখানে তাঁদের ক্ষেত-খামার ছিল। মা-বাবার কাছেই তিনি যা' কিছু শিক্ষালাভ করেন।

অতি শৈশব থেকেই গোলাবাড়িতে ওয়ালটার হাণ্ট যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের খেয়ালে মেতে থাকতেন। সেই সময় তিনি বাড়ির লোকেদের কাপড়ের জন্যে উন্নত ধরণের একটা চরকা তৈরী করেছিলেন। তারপর তিনি দশ বছর যাবৎ কৃষিকার্য্য

নিয়ে দিন কাটান। কিন্তু যিনি জন্মেছেন পৃথিবীকে নানা আবিষ্কারে ভরিয়ে দিতে, তিনি তো আর বেশিদিন ক্ষেত-খামারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তাই হাণ্টকে আবার ফিরে আসতে হয় নিজের গবেষণাগারে।

ইতিমধ্যে পলি লক্‌স্ নামে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কিন্তু কেবল গবেষণাগারে বসে থাকলে সংসার চলে না। সংসার চালাবার জন্যে চাই অর্থ। অর্থোপার্জ্জনের কথা তিনি চিন্তা করতে থাকেন।

সংসারে দারুণ অভাব। বাইরের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আর ধার পাওয়া যায় না। মাত্র পনেরো ডলারের জন্যে তাঁর পাওনাদার তাঁকে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে যায়। ক্ষোভে-দুঃখে তিনি হাতে একটি তামার তার নিয়ে মোচড় দিতে থাকেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এই তামার তারটার দুটো মুখ যদি আটকে দেওয়া যায়, তাহলে তা' বোতামের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। আবিষ্কার হয় আজকার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস —সেফ্‌টিপিন।

দেনার দায়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাত্র চার শত ডলারের বিনিময়ে তিনি তার সেফ্‌টিপিন তৈরী করার স্বত্ব বিক্রি করলেন।

একদিন লিখতে লিখতে হাণ্ট বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, বারবার দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালি না নিয়ে কালিটা যদি একবারে কলমের মধ্যে রাখা যায়, আর ঐ কালিটা যদি একটু একটু করে কলমের মুখে আসে, তা'হলে বেশ আরামে লেখা যায়।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। হাণ্ট তৈরী করে ফেললেন একটা ফাউণ্টেনপেন।

ফাউণ্টেনপেনের ব্যবসা করবার জন্যে তিনি ব্যবসা-মার্কাও করলেন। কিন্তু তাঁর এমনিই দুর্ভাগ্য, তাঁর তৈরী কলম বাজারে চললো না। তাই বিরক্ত হ'য়ে তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দেন।

এর ৩৭ বছর পরে লুই ওয়াটারম্যান্ নামে এক ভদ্রলোক ফাউণ্টেনপেন তৈরী করে বাজারে চালু করেন—লোকেও তাঁর তৈরী ফাউণ্টেনপেন ব্যবহার করতে থাকে।

এইভাবে ফাউণ্টেনপেনের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা হয়েও কেবল আইনের জন্যে লুই ওয়াটারম্যান্ ফাউণ্টেনপেনের আবিষ্কর্ত্তা বলে পরিচিত হলেন।

কোনও এক শীতের রাত্রে বসে আছেন হাণ্ট তাঁর নিজের ঘরে। হঠাৎ তার মনে হল, কি করে কম খরচায় সমস্ত ঘরটাকে গরম রাখা যায়। যেমনি ভাবা, অমনি

কাজ। তাঁর গবেষণা চলতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তিনি 'গ্লোব ষ্টোভ' আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি এমনই যে, সামান্য কয়লা দিয়ে জ্বালালেই সমস্ত ঘরটা গরম রাখা যায়।

হাণ্ট মনে করেছিলেন, এই ষ্টোভ বিক্রি করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করবেন। কিন্তু তা' আর হল না। নিদারুণ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল, যদি কাপড়ের কলারের বদলে কোনরকমে সস্তায় কাগজের কলার তৈরী করা যায়, তা'হলে বোধ হয় জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে।

খুব শীঘ্রই তিনি কাগজের কলারও তৈরী করে ফেললেন। "ইউনিয়ন পেপার-কলার কোম্পানী"কে তিনি এই কলারের স্বত্ব বিক্রি করেন, এবং প্রতিটি কলারের ওপর তিনি রয়েলটি দাবী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লোকে তখন এ-কলার ব্যবহার করলো না। এর ব্যবহার চালু হল তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে হাণ্ট তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করেন। একদিন তাঁর মনে হয়, হাতে করে জামা-কাপড় সেলাই করতে অনেক দেরী হয়। তার চেয়ে যদি এমন একটা যন্ত্র তৈরী করা যায়, যার সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি এবং সুন্দর সেলাই করা যেতে পারে। বহুদিন মাথা ঘামিয়ে হাণ্ট আবিষ্কার করেন একটি সেলায়ের কল। এর আগে অবশ্য বার্থেগেসি থিম্মোনিয়ের নামে এক ভদ্রলোক একটি সেলায়ের কল আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাতে কেবল 'চেন' সেলাই করা যেত। তাই প্রকৃতপক্ষে সেলাই-কলের আবিষ্কর্ত্তা হলেন হাণ্ট। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম সেলায়ের কলের কী পরিণতি হয়েছিল জানো? শুনলে তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে। কলটি আবিষ্কার করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে দেখান। আশা করেছিলেন, কয়েকটা উৎসাহের বাক্য শুনতে পাবেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তিনি পেলেন দারুণ ভর্ৎসনা। রেগে গিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন,—"করেছো কি! এই সেলাই-কল সমস্ত দর্জ্জিদের বেকার করে দেবে!"

ফলে হাণ্ট এটিকে আর ব্যবসা-মার্কা না করিয়ে এক কামারকে বিক্রি করে দেন। কামারটিও এর মর্ম্ম না বুঝে সেটি আগুনে গালিয়ে ফেলে।

এর বহুদিন পর ইলিয়াস হাউয়ে নামে এক ভদ্রলোক সেলায়ের কল আবিষ্কার করেন। এবারেও প্রকৃতপক্ষে সেলায়ের কলের আবিষ্কর্ত্তা হয়েও কেবল আইনের দ্বারা সে সম্মান থেকে হাণ্ট হলেন বঞ্চিত। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবারে তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন।

আইজ্যাক সিঙ্গার নামে এক ভদ্রলোক হাউয়ের সেলায়ের কলটি নিয়ে ব্যবসা

সুরু করেন। তিনি জানতেন হাণ্টের সেলায়ের কলের কথা। হাউয়ের সঙ্গে [illegible] ঘটায় সিঙ্গার হাণ্টকে ডেকে পাঠান, এবং পঞ্চাশ হাজার ডলারে তাঁর সেলাই-[illegible] সমস্ত স্বত্ব কিনে নেন। কৃতজ্ঞতায় হাণ্টের দুচোখ জলে ভরে আসে।

এছাড়া সিঙ্গার বলেন যে, পরবর্ত্তী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার তিনি হাণ্টকে দেবেন।

আজকের সিঙ্গার কোম্পানীর সেলায়ের কল সারা পৃথিবীব্যাপী চালু হয়েছে। এই কলেরই আবিষ্কর্ত্তা ওয়ালটার হাণ্ট।

● জেনে রাখ

১নং চিত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেসনস্ থেকে জার্ম্মাণী প্রথম বেরিয়ে যায়। তারপর একটি একটি [illegible] বহু দেশ লীগের আওতার বাহিরে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বস্তি পরিষদ (সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ) থেকে এখনও কেউ [illegible] যায়নি। সম্প্রতি কাশ্মীরের দখলী সত্ত্ব নিয়ে স্বস্তি পরিষদের সততায় আমাদের আস্থা কমে গেছে। শীঘ্র যদি [illegible] ভাঙন ধরে, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

২নং চিত্র। সম্প্রতি জাপানীদের একটি দল চীন সফরে গিয়েছিল। চীন লাল হবার আগে তার বহু অংশ জাপানের অন্তর্ভুক্তও হয়েছিল। চীন তার জড়তা কাটিয়ে আবার মাথা তুলেছে। এখন চীন-জাপানে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ নেই।

৩নং চিত্র। পেটেন্ট অফিস কাকে বলে জান? কোন কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হলে, আবিষ্কার[illegible] আবিষ্কার যেখানে লিখে রেজেষ্টি করে রাখে, তার নাম পেটেন্ট অফিস। সেই আবিষ্কৃত দ্রব্যের উপর তখন আবি[illegible] সত্ত্ব স্থাপিত হয়। কেউ সে আবিষ্কার নকল করলে আইনের সাহায্যে আবিষ্কারক নকলকারীর কাজ বন্ধ করে দিতে [illegible] আবিষ্কার রেজেষ্টি করবার জন্ম আমেরিকায় এর এক অফিস আছে। সেখানে প্রতিদিন ৩০০ আবিষ্কার রেজেষ্টি হচ্ছে। এ দেশে রোজ একটা হয় কিনা সন্দেহ? এই থেকে বোঝা যায় ওরা কত কর্ম্মশীল।

নয়নগড়ের রাজকুমার

—মুরারিমোহন বিট্

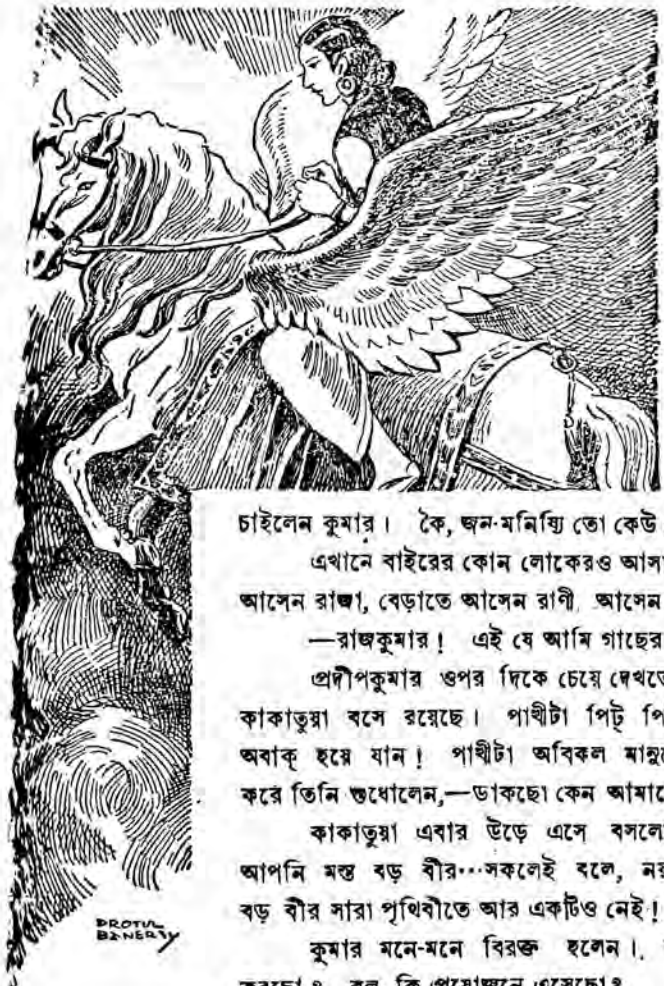

যে সময়ের কথা, সেই সময় নয়নগড় রাজ্যের ছোট রাজপুত্র প্রদীপকুমারের বীরত্বের কাহিনী সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সবার মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা—অমন সাহসী বীর নাকি হয় না!

সেদিন বৈকালে প্রদীপকুমার প্রাসাদের উদ্যানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন, সহসা কে যেন ডেকে উঠলো,—রাজকুমার!

সচমকে এ দি ক-ও দি ক চাইলেন কুমার। কৈ, জন-মনিষ্যি তো কেউ নেই! তবে কে ডাকে?

এখানে বাইরের কোন লোকেরও আসার সম্ভাবনা নেই। এখানে বেড়াতে আসেন রাজা, বেড়াতে আসেন রাণী, আসেন রাজকন্যা আর রাজপুত্রেরা।

—রাজকুমার! এই যে আমি গাছের ওপর। আমি মানুষ নই—পাখী।

প্রদীপকুমার ওপর দিকে চেয়ে দেখতে পান, চাঁপাগাছটার সরু ডালে একটা কাকাতুয়া বসে রয়েছে। পাখীটা পিট্ পিট্ করে তাঁরই দিকে চাইছে। কুমার অবাক্ হয়ে যান! পাখীটা অবিকল মানুষের মতই কথা বলছে। বিস্ময় দমন করে তিনি শুধোলেন,—ডাকছো কেন আমাকে?

কাকাতুয়া এবার উড়ে এসে বসলো তাঁর সামনে। বললো,—শুনেছি আপনি মস্ত বড় বীর···সকলেই বলে, নয়নগড়ের মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্রের মত বড় বীর সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই!

কুমার মনে-মনে বিরক্ত হলেন। বললেন,—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো? বল, কি প্রয়োজনে এসেছো?

কাকাতুয়া বললো,—বলছি শুনুন। এখান থেকে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্তিরের পথ তফাতে এক বিরাট পাহাড়ের গুহায় এক দুর্দ্দান্ত কাপালিকের গোপন প্রাসাদ আছে। ঐ কাপালিক শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। ফলে সে নিজের খুশীমত যে কোন কাজ করতে পারে···নিজের চেহারাও বদলাতে পারে। তার অত্যাচারে মাল্যদ্বীপ রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেছে! কখন কার ওপর কিভাবে যে তার অত্যাচার সুরু হবে, তা কেউ বলতে পারে না! কত মেয়ে যে সে হরণ করে এনেছে বিয়ে করবার জন্যে, তার ইয়ত্তা নেই!

কুমার সোজা হয়ে বসে বললেন,—এ কথা সত্যি কাকাতুয়া?

—সত্যি রাজকুমার! আমার কথার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যি! আমার আরও বলবার আছে শুনুন। মাল্যদ্বীপের নাম শুনেছেন তো?

—শুনেছি। শুনেছি নাকি মাল্যদ্বীপের রাজকন্যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী?

—ঠিকই শুনেছেন। আমি সেই মাল্যদ্বীপের রাজকন্যার পোষা কাকাতুয়া। আমার মনিবকেও ঐ দুষ্ট কাপালিক হরণ করে নিয়ে গেছে!

—রাজকন্যাকে?

—হ্যাঁ, রাজকুমার! আমার চোখের সামনেই পিশাচটা মনিবকে হরণ করে। আমি তার পিছু পিছু উড়ে গিয়েছিলাম···গিয়ে চিনে এসেছি তার গুপ্ত প্রাসাদ। সেই গুহার মধ্যেই আমার মনিব বন্দিনী হয়ে আছেন পাষাণ হয়ে!

প্রদীপকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠলেন,—পাষাণ হয়ে? সে কি কাকাতুয়া?

—হ্যাঁ, রাজকুমার, সত্য কথাই বলছি। সেখানে নিয়ে গিয়ে কাপালিক আমার মনিবকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু মনিব রাজী হন নি। তাই কাপালিক মন্ত্রবলে আমার মনিবের কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত পাষাণ করে দিয়েছে। কথা বলতে পারেন; কিন্তু উঠবার-বসবার বা নড়া চড়া করবার ক্ষমতা নেই! সেখানে এমনি আরও তিনটি মেয়ে পাষাণ হয়ে আছে দেখেছি! তারা রাজার মেয়ে নয়—সাধারণ ঘরের মেয়ে।

মনিবের এই অবস্থা দেখে আমি হিমালয় পাহাড়ে যাই সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে। কেননা, সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক কিছু বলতে পারেন। ঘুরতে ঘুরতে এক ঝর্ণার ধারে একজন সাধুর দেখা পেলাম। সব জানালাম তাঁকে। শুনে তিনি দয়াপরবশ হয়ে বললেন,—'ক্ষীরসমুদ্রের মাঝখানে চম্পাদ্বীপ··· সেই দ্বীপের মধ্যে এক ছোট্ট পাহাড় আছে—নাম নীলপাহাড়। সেই নীলপাহাড়ের পাদদেশে ধ্যান করেন আমার গুরু—তাঁকে জিজ্ঞেস করলে উপায় পাবে।' আমি আর দেরি না করে ক্ষীরসমুদ্রের দিকে রওনা হলাম।

ক'দিন পর ক্ষীরসমুদ্রের তীরে পৌঁচেছিলাম, ঠিক মনে নেই। কিন্তু ক্ষীরসাগর পেরিয়ে চম্পাদ্বীপে পৌঁছাতে আমার সাতদিন সময় লেগেছিল। নীলপাহাড়ের পাদদেশে সাধুর দেখা পেলাম। সব শুনে তিনি বললেন,—'ঐ কাপালিকের মৃত্যু আছে এক নরকঙ্কালের হাতে। সেই কঙ্কাল ছাড়া ওকে আর কেউ বধ করতে পারবে না! কিন্তু তার আগে অনেক কিছু করবার আছে এবং সে-কাজ একমাত্র রাজার ছেলের পক্ষেই সম্ভব! এমন একজন রাজপুত্রকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো, যে সত্যকারের সাহসী বীর, এবং যে স্বেচ্ছায় তোমার মনিবকে উদ্ধার করবার ভার নেবে! তাকেই আমি উদ্ধারের উপায় বলে দেব।' তাই আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে হয়তো আমার মনিব এবং অন্য মেয়েরা বেঁচে যাবে!

প্রদীপকুমার তখুনি বাপ-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কাকাতুয়া তাঁকে পথ দেখিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চললো······

যেতে যেতে কাকাতুয়া একসময়ে বললো,—একটা কথা মনে পড়ছে রাজকুমার! কাপালিকের প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় আমার মনিব একদিন এক স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক রাজার ছেলে ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে······আর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি।

কুমার শুধু হাসলেন।

কাকাতুয়া বলতে লাগলো,—তারপর সেই রাজপুত্র গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করলেন। তখন আমার মনিব সেখানেই বনফুলের মালা গেঁথে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন।

কুমার চাইলেন কাকাতুয়ার মুখের দিকে। কাকাতুয়া বললো,—এই স্বপ্নের কথা মনিবের মুখেই আমি শুনেছি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁর স্বপ্ন যদি কোনদিন সফল হয়, তাহলে সেই স্বপ্নের রাজকুমারকেই তিনি বিয়ে করবেন; নচেৎ অন্য উপায়ে উদ্ধার পেলেও তিনি জীবনে কোনদিন বিয়ে করবেন না!

কুমার কোন কথা বললেন না।

তেরো দিন তেরো রাত্রি পর কুমারকে নিয়ে কাকাতুয়া ক্ষীরসাগরের তীরে এসে পৌছালো। সম্মুখে উর্ম্মিমুখর অসীম জলরাশি! কুমার বললেন,—কাকাতুয়া, এখন উপায়?

কাকাতুয়াও হতাশ হয়ে পড়লো। কুমার এ সমুদ্র কেমন করে পার হবেন, তার কোন উপায় সে জেনে আসে নি সাধুর কাছ থেকে। এখন চম্পাদ্বীপে গিয়ে উপায় জেনে আসতেও চৌদ্দ দিন সময় লেগে যাবে! কিন্তু তাছাড়া আর উপায়ও তো নেই! অগত্যা কাকাতুয়া সে-কথাই জানালো কুমারকে। কুমার বললেন,—কী দরকার কাকাতুয়া এত সময় নষ্ট করবার? তুমি উড়ে উড়ে চলো, আমি সাঁতার কেটে যাই।

বলে ঘোড়াটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রেখে কুমার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমুদ্রের বুকে······

একদিন একরাত কাটলো······

দু'দিন দু'রাত কাটলো······

এমনিভাবে পাঁচদিন পাঁচ রাত কাটলো। কুমার আর সাঁতার দিতে পারেন না। হাত-পা তাঁর অবশ হয়ে আসছে···আর পারেন না এগোতে। চীৎকার করে বললেন,—কাকাতুয়া, আমি যে আর সাঁতার কাটতে পারছি না!

কী সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? কুমার বিশ্রাম নিতে পারেন, জলের বুকে এমন আশ্রয় কোথায়? কাকাতুয়া সাহস দিয়ে বললো,—আর বেশি দূর নয়, আমরা তো প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি!

কিন্তু কুমার আর অগ্রসর হতে পারলেন না—ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন জলের তলায়!

অনেকক্ষণ পর মাটিতে তাঁর পা ঠেকলো। চেয়ে দেখলেন, সামনেই সিঁড়ি—নীচের দিকে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে কুমার পাতালে নামতে লাগলেন······

নামতে নামতে এক সময় এসে পৌছালেন ছবির মত সাজানো একটি সুন্দর পুরীর মাঝখানে। উঠানে খেলা করছে পরীর মত সুন্দর কতকগুলি মেয়ে। তারা কুমারকে দেখে বললো,—কে গা তুমি? কোন্ দেশে তোমার ঘর?

কুমার সসঙ্কোচে বললেন,—আমি মর্ত্ত্যলোকের এক রাজার ছেলে। জলে ডুবে গিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

তারা তামাসা করে বললো,—সাঁতার কাটতে জানো না বুঝি? এসো, তোমাকে আমাদের রাণীমায়ের কাছে নিয়ে যাই। জলদেবীর নাম শুনেছো, এটি তাঁরই প্রাসাদ…তাঁর কাছেই তোমাকে নিয়ে যাব, এসো।

তারপর কুমার ওদের সঙ্গে অনেকগুলো ঘর-বারান্দা পার হয়ে জলদেবীর কক্ষে এসে হাজির হলেন। মণি-মুক্তা-খচিত প্রবাল পাথরের দেওয়াল। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ শ্বেত পাথরের তৈরী ঘরের মেঝে। মাথার ওপর রামধনু রঙের চন্দ্রাতপ…সোনার পালঙ্কে, মখমলের শয্যায় অলসভাবে বসে রয়েছেন জলদেবী। তাঁর উভয় পার্শ্বে দুজন পরিচারিকা তাঁকে ব্যজন করছে……

কন্যারা বললো,—রাণীমা, ইনি মর্ত্ত্যলোকের রাজার ছেলে। জলে ডুবে গিয়ে এখানে এসে পড়েছেন!—বলে খিল্ খিল্ করে তারা হাসতে লাগলো।

জলদেবী কুমারের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জানতে চাইলেন। সব জেনে নিয়ে বললেন,—তুমি ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁচেছো কুমার। তুমি নীলপাহাড়ে যে সাধুর কাছে যাচ্ছিলে, তিনি আমারই পিতা। বাবার সংসার-জীবন ভাল লাগে না, তাই তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন নীলপাহাড়ে। বাবার কাছে গেলে তিনি তোমাকে আমার এখানেই পাঠাতেন। কেননা, একমাত্র আমিই জানি, কেমন করে ঐ দুর্দ্দান্ত কাপালিককে নিহত করা যাবে!

কুমার করযোড়ে ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন,—শীঘ্র বলুন দেবী, কেমন করে ঐ কাপালিককে নিধন করতে পারি, আর কেমনভাবেই বা কন্যাদের পাষাণ দেহ থেকে মুক্তি দিতে পারি?

—শোন বলি। কাপালিকের গুপ্তপুরীর মধ্যে একটা বিশেষ গুপ্ত কক্ষ আছে। সেই কক্ষের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে একটা জীবন্ত পূর্ণ নরকঙ্কাল আটকানো আছে। কঙ্কালটার দু'চোখের কোটরে অদ্ভুত রকমের দুটো পাথর দপ্‌দপ্ করে জ্বলে! পাথর দুটোর এমন অদ্ভুত গুণ এই যে, কোন প্রাণী ঐ পাথর দুটোর সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে গেলেই তাকে সম্মোহিত করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কোন সম্মোহিত মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী পাথর দুটোর তীব্র আকর্ষণে নিকটে পৌঁছালেই কঙ্কালটা দু'হাতে গলা টিপে ধরে তাকে হত্যা করে।

জলদেবী বলতে থাকেন,—এই পাথর দুটোর সঙ্গে কঙ্কালটার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। পাথর দুটোর শক্তিতে যারা সম্মোহিত হয়ে কাছে এগিয়ে যাবে, কেবল তাদেরই হত্যা করবে কঙ্কালটা। যারা সম্মোহিত হবে না, তারা কাছে গেলেও কঙ্কাল তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

প্রতিদিন রাত্রে শ্মশানে শব-সাধনা করতে যাবার সময় কাপালিক কঙ্কালের চোখ থেকে ঐ পাথর দুটো খুলে নিয়ে যায়। সাধনার ফলে শব যখন জেগে ওঠে, তখন ঐ পাথর দুটোর সাহায্যে শবকে সম্মোহিত করে তার ওপর নানা হুকুমজারী করতে থাকে। শব সেই সব হুকুম যথাযথ পালন করে। তারপর শ্মশান থেকে ফিরে এসে সে পাথর দুটো আবার কঙ্কালের চোখে বসিয়ে রাখে।

পাথর দুটোর প্রভাবে কাপালিক সম্মোহিত হয় না। যারা শব-সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে কেবল তাদের কাছেই পাথর দুটোর শক্তি ব্যর্থ হবে! কিন্তু আমি তোমাকে এমন দুটো পাথর দেব,

যার সম্মোহনী-শক্তি শব-সাধকেরাও রুখতে পারবে না ! এখন তোমার কাজ হবে, কঙ্কালের চোখের পাথর দুটো খুলে আমার পাথর দুটো তার চোখে বসিয়ে দেওয়া ! ফলে যা হবে, তুমি নিজের চোখেই তা দেখতে পাবে !

প্রদীপকুমার বললেন,—কিন্তু কেমন করে আমি কঙ্কালের কাছে যাব ? আমাকেও তো সে আকর্ষণ করে হত্যা করবে !

জলদেবী বললেন,—না, তা করবে না। আমার দেওয়া পাথর সে-পাথরের আকর্ষণী-শক্তি খণ্ডন্ করবে। আবার আমার পাথরের আকর্ষণী-শক্তি সে পাথর খণ্ডন করবে !···আচ্ছা, আগে তুমি বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবো।

সেদিনটা কুমার জলদেবীর অনুরোধে তাঁর প্রাসাদেই অতিথি হয়ে রইলেন। রাত্রে তাঁর দুচোখে ঘুম এলো না—সারা রাত তিনি সোনার পালঙ্কে ছট্‌ফট্ করে কাটালেন।

ভোর হল। জলদেবী তাঁকে একটি নৌকা দিয়ে রওনা হতে বললেন। জলদেবীর আশীর্ব্বাদ, উপদেশ, আর তাঁর দেওয়া পাথর দুটো নিয়ে কুমার রওনা হলেন।

ঢেউএর মাথায় মাথায় নেচে নেচে নৌকা এগিয়ে চললো। দিন যায়, রাত আসে···রাত যায়, দিন আসে...

রাজকুমার অধীরভাবে কূলের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

ঐ যে তীর দেখা যাচ্ছে না ? অনেক দূরে—দিগন্তের কোলে সবুজ রেখা ?

তীরের ওপর একটা গাছের ডালে বিরস-বদনে বসে ছিল কাকাতুয়া। কুমারকে আসতে দেখে সে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো,—রাজকুমার ! রাজকুমার !—

টগ্‌বগ ···টগ্‌বগ্···টগ্‌বগ্···

ঘোড়া ছুটলো আবার। আর মাথার ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে উড়ে চললো কাকাতুয়া। চলতে চলতে ক'দিন ক'রাত পর কুমারকে নিয়ে এক গভীর অরণ্যের ধারে এসে পৌছালো কাকাতুয়া। বললো কুমারকে,—এই বনের মধ্যেই আছে সেই পাহাড়—যে পাহাড়ের মধ্যে কাপালিকের গুপ্তপুরী !

তারপর ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে বেঁধে রেখে কুমার কাকাতুয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের গহন প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌছালেন, তখন সন্ধ্যা।

কাকাতুয়া বললো,—বাঁ ধারে একটু অগ্রসর হলেই গুহার পথ পাওয়া যাবে। ওটা হল সদর পথ। ও পথ দিয়ে ভেতরে যাওয়া এখন বিপদ। গুহার বাসিন্দারা এখন সকলেই জেগে আছে···আমরা তাদের নজরে পড়ে যাবো। কাপালিক অবশ্য এখন নেই···সে আসবে মাঝরাতে···এসে পাথর দুটো নিয়ে শ্মশানে যাবে। সদর পথ ছাড়া আরও একটা পথ আছে আমি জানি। সেটা গুপ্তপথ। ঐ গুপ্তপথ দিয়েই আমরা ভেতরে যাবো। তাতে ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। ঐ পথটা দিয়ে প্রাসাদের শেষ প্রান্তে পৌছানো যায়। সেদিকটা একেবারে নির্জ্জন। কোন লোকজন থাকে না··· কাউকে যাওয়া-আসাও করতে দেখিনি সেদিকে। আর আপনি যে কঙ্কালের ঘরের কথা বলছেন, সে-ঘরটাও আছে ঐদিকে।

কুমার জিজ্ঞেস করলেন,—সেটা কঙ্কালের ঘর, তুমি ঠিক জানো ?

—না, তা ঠিক জানি না। তবে সেই ঘরটার মধ্যে থেকেই কাপালিককে দুটো পাথর নিয়ে বেরুতে দেখেছিলাম। তাই মনে হচ্ছে, সেই ঘরটাই কঙ্কালের ঘর।…আসুন।

অনেকটা ঘুরে কাকাতুয়া গুপ্তপথ দিয়ে প্রবেশ করলো প্রদীপকুমারকে সঙ্গে নিয়ে। সরু পথ……ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রদীপকুমার তলোয়ারটা হাতে নিয়ে কাকাতুয়ার পিছু পিছু অগ্রসর হতে লাগলেন।

অনেকটা গিয়ে আবছা আলো দেখতে পেলেন এবং সমতল জমিতে পা দিলেন। দূরে একটা মশাল জ্বলছে, তারই আলো।

কুমার দেখলেন, তিন-চারটে পরিষ্কার পথ তিন-চারদিকে চলে গেছে। ডানদিকের পথটা দেখিয়ে কাকাতুয়া বললো,—এই পথে আসুন।

অনেকদূর অগ্রসর হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গে এসে পৌছালেন কুমার। অত্যন্ত নোংরা জায়গা… এখানে-ওখানে বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে। সুড়ঙ্গের গায়ে বড় বড় ফাটল…অসমতল এবড়ো খেবড়ো পথ…পথের ওপর জমে রয়েছে বহু কালের ধুলো-বালি…

এই পথ ধরে একটু এগোতেই কুমার দেখলেন, পথ রুদ্ধ করে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ঘর। কাকাতুয়া বললো,—এই ঘর থেকেই কাপালিককে পাথর দুটো নিয়ে বেরুতে দেখেছিলাম—এটাই বোধ হয় কঙ্কালের ঘর। আপনি ভেতরে যান, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

ঘরটার দরজার মুখে একটা পাথর চাপানো। অনেক কষ্টে পাথরটা সরিয়ে কুমার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভেতরে ঢুকেই কঙ্কালটা দেখে আঁত্‌কে উঠলেন ভয়ে! ঘরের এককোণে একটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে একটা মোটা লোহার শিকের সঙ্গে কঙ্কালটার দেহটা শক্ত করে আটকানো রয়েছে। তার চোখ দুটো দিয়ে উজ্জ্বল নীল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে!

কুমার ভেতরে প্রবেশ করতেই কঙ্কালের হাত দুটো একবার দুলে উঠলো…পরক্ষণেই থেমে গেল আবার। কয়েক মুহূর্ত কঙ্কালটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কুমার এগিয়ে গেলেন। উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন, পাথর দুটো তাঁকে আকর্ষণ করছে কি না? নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আরও অগ্রসর হলেন—একেবারে কঙ্কালটার গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে চোখের পাথর দুটো খুলে নিয়ে জলদেবীর দেওয়া পাথর দুটো বসিয়ে দিলেন। মুহূর্ত আর দাঁড়ালেন না—ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

কাকাতুয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করলো,—কাজ শেষ হয়েছে রাজকুমার?

কুমার বললেন,—হয়েছে। এখন কোথায় আশ্রয় নিই বলো তো? এই ঘরটার কাছাকাছি থাকারই আমার ইচ্ছা।

কাকাতুয়া বললো,—জায়গার অভাব কি? আশে-পাশে কতই তো ফাটল রয়েছে, যে কোন একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লেই তো হল!

পছন্দমত একটা বেশ বড় ফাটলের মধ্যে কাকাতুয়াকে নিয়ে প্রবেশ করলেন প্রদীপকুমার।

এদিকটা নিঃঝুম। দূর থেকে গুহাবাসীদের অস্পষ্ট কোলাহল কাণে আসছে! একটু পর ধীরে ধীরে সে-কোলাহলও থেমে গেল। কাকাতুয়া বললো,—সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখানকার লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কাপালিকের আসতে এখনো বহু দেরি।···চলুন, এই ফাঁকে আমার মনিবকে দেখে আসবেন।

ফাটল থেকে বেরিয়ে কাকাতুয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন কুমার।

অনেকটা গিয়ে এদিক-ওদিক অনেকগুলো মশাল জ্বলতে দেখলেন কুমার। আরও দেখলেন, পথের দুধারে সুন্দর সুন্দর ঘরের শ্রেণী। কাকাতুয়া বললো,—প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যেই এক-একটি মেয়ে আছে। এদের সকলকেই কাপালিক হরণ করে এনেছে, আর এরাও সকলে কাপালিককে পতিত্বে বরণ করেছে। যারা রাজী হয়নি, তারা আছে ওধারে পাষাণ হয়ে! আমার মনিবও আছেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে কাকাতুয়া বললো,—এই ঘরের মধ্যেই আছেন আমার মনিব—মাল্যদ্বীপের রাজকন্যা। আসুন ভেতরে।

ভেতরে প্রবেশ করে কুমার দেখলেন, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে পালঙ্কের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখখানা তার ফুটন্ত পদ্মের মত। টানা টানা দুটি নিদ্রিত চোখের ওপর যেন তুলির আঁচড়ে আঁকা দুটি নিখুঁত ভ্রূ! চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং···কিন্তু কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত নিকষ-কালো কঠিন পাথর! কাপালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-দেহ থেকে এরা মুক্তি পাবে।

এমন সময় বহুদূরে গুরুগম্ভীর স্বর জেগে উঠলো: জয় মা কালী শ্মশানবাসিনী!

চমকে উঠে কাকাতুয়া বললো,—কাপালিক আসছে! শিগ্‌গীর পালিয়ে আসুন—

ছুটতে ছুটতে ওঁরা আবার সেই ফাটলের মধ্যে এসে ঢুকলেন। একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। কুমার উঁকি দিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, কাপালিকই আসছে! ওঃ, কী ভীষণ চেহারা! প্রায় চার হাত লম্বা দেহ! সারা মুখখানা বড় বড় দাড়ি-গোঁফে ভর্ত্তি···মাথায় বড় বড় জটা···চোখ দুটো জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল ··গলায় রুদ্রাক্ষের মালা···কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর রক্তের তিলক! পরণে রক্তবর্ণের কাপড় আর হাতে ত্রিশূল···সে এক বীভৎস চেহারা!

প্রদীপকুমার আর কাকাতুয়ার সামনে দিয়েই কাপালিক হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল কঙ্কালের ঘরটার দিকে। কুমার উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন।

দরজার পাথর সরিয়ে কাপালিক প্রবেশ করলো কঙ্কালের ঘরে। প্রবেশ করে কঙ্কালটার দিকে এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ। হাঁ করে অপলক দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো কঙ্কালটার দিকে···চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো তার। তারপর ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগলো কঙ্কালটার দিকে···

কঙ্কালের হাত দুটো জোরে জোরে দুলতে লাগলো। হত্যার নেশায় হাত দুটো যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে!

কাপালিকের হাত-পা, সারা দেহ-মন অসাড় হয়ে গেছে! তাকে কেউ যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমনভাবে সে এগিয়ে চললো···

কঙ্কালটার কাছে গিয়ে পৌঁছাতেই কঙ্কালটা দু'হাত উঁচু করে তুললো, তারপর কাপালিকের

গলাটা চেপে ধরলো জোরে। প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো কাপালিক! তারপরই গোঁ-গোঁ করতে করতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে সে মরে গেল!

প্রদীপকুমার ফাটল থেকে বেরিয়ে কঙ্কালের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, কাপালিক মরে পড়ে আছে। সে-সংবাদ কাকাতুয়াকে জানাতেই কাকাতুয়া আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। বললো,—আসুন রাজকুমার, এবার মনিবের কাছে যাই; তিনি নিশ্চয় পাষাণ-দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন!

ঈশ্বরের কাছে কাপালিকের আত্মার সদ্‌গতি হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে কুমার কাকাতুয়াকে অনুসরণ করে চললেন। গিয়ে দেখলেন, রাজকন্যার আর পাষাণ-দেহ নেই,—মুক্তি পেয়ে গেছেন। জলদেবীর কথা সত্য হয়েছে।

অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে শুয়ে আছে।

কন্যা তখনো ঘুমুচ্ছেন। কাকাতুয়ার ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙতেই তিনি অনুভব করলেন, তাঁর পাষাণ-দেহ আর নেই! তিনি বারবার নিজের দেহের দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর প্রদীপকুমারের দিকে নজর পড়তেই তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন।

কাকাতুয়া বললো,—ইনি নয়নগড় রাজ্যের ছোট রাজকুমার! ইনিই আপনাদের বাঁচিয়েছেন—কাপালিকেরও মৃত্যু হয়েছে!

কন্যা অপলক দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন কুমারের দিকে। কুমারও দেখতে লাগলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীকে!

কন্যা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাইতে-চাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলেন, জানো কাকাতুয়া, এখানে বন্দিনী হয়ে পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রিতে যে রাজপুত্রের স্বপ্ন আমি দেখতাম, তাঁকে ঠিক এঁরই মত দেখ্‌তে! ইনিই ঘোড়ায় চড়ে আমাকে বাঁচাতে আসছেন—রোজই দেখতাম এই স্বপ্ন!

কথাটা বলেই কন্যা বড় লজ্জিত হয়ে পড়লেন। নিতান্ত অসাবধানেই কথাটা বেরিয়ে এসেছে তাঁর মুখ থেকে।

কুমার এবার রাজকন্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—আমি তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি, তুমি আমায় স্বপ্ন দেখতে—এ আমার পক্ষে খুবই আনন্দের কথা! আমি আরও সুখী হবো, যদি তুমি আমাকে বিয়ে করো।

কন্যার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কাকাতুয়াকে ডেকে বললেন,—আমার স্বপ্ন বুঝি সার্থক হল কাকাতুয়া! তুমি কিছু বনফুল যোগাড় করে নিয়ে এসো—মালা গাঁথবো।

তারপর?

তারপর সেই কাপালিকের গুহার মধ্যেই রাজকুমার আর রাজকন্যার মালা-বদল হয়ে গেল। গুহার অন্যান্য যেসব মেয়েদের কাপালিক হরণ করে এনেছিল, তাদের নিজেদের নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে মাল্যদ্বীপের কন্যা আর কাকাতুয়াকে নিয়ে প্রদীপকুমার নিজের রাজ্যের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

বৃষ্টি আসে

—শ্যামলকুমার চক্রবর্ত্তী

বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে,
মেঘলা দিনে নরম ঘাসে।
ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে ভুবন,
সিক্ত পাতায় ভরিয়ে এ বন।
গাছের পাতা কাঁপিয়ে ত্রাসে,
বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে।

মেঘলা ভিজে আকাশ জুড়ে,
তিনটে চাতক উড়ছে ঘুরে।
ভিজছে কত নাম না-জানা,
চড়ুই শালিক আর কত না।
মেঘের কোলে বিজলী হাসে,
বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে।

চাঁপার ডালে লাগলো কাঁপন,
আবছা হ'লো আমলকী বন।
রূপকাহিনী সঙ্গোপনে,
শুনছে খোকন আপন মনে।
বর্ষাকালে আষাঢ় মাসে,
বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে।

মিনির বাজীমাৎ

—বিষাদবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিতান্ত ছোটখাটো গ্রাম নয় শ্রীকণ্ঠপুর। প্রায় সাতশো ঘরের কাছাকাছি লোকের বসবাস।

আর এই শ্রীকণ্ঠপুরের বামুনপাড়ায় পীতাম্বর মুখুজ্জ্যের 'চরণ-কুঠি' বাড়ীটি লোক সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। পাড়া-পড়শী পাঁচজনে তাই আড়ালে-আবডালে মুচকি হেসে ঠাট্টাচ্ছলে কানাকানি করে, বলে, 'আহা-হা, যেন রাবণের গুষ্টি!'

সত্যি বলতে কী, নেহাৎ মিছে নয় তাদের উপহাসটুকু। কেননা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মুখুজ্জ্যে-কর্ত্তার মাত্র সাতটি ছেলে, আর মেয়ে তিনটি। আবার নাতি নাতনীদের সংখ্যা তো আঙুলে গুণে শেষ করা এক অসম্ভব ব্যাপার। বিরাট বাহিনী।

সম্প্রতি সেই পীতাম্বর মুখুজ্জ্যের বাড়ীতেই বলো কিংবা শ্রীকণ্ঠপুরের রাবণের গুষ্টিতেই বলো ভারী মজার একটি ঘটনা ঘটে গেছে। বলি শোনো।

প্রথমতঃ বলে রাখি, মুখুজ্জ্যেমশায়ের সাত ছেলের মধ্যে কেবল ছোটটিই বাড়ী থাকে সকল সময়ে এবং বাকী সবাই চাকরি-বাকরির খাতিরে, সংসার পেতে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোট-বড়ো শহরে। তিনটি মেয়েরও বিয়ে-থা হয়ে গেছে অনেকদিন। অতএব তারাও থাকে বাইরে বাইরে।

চৈত্র দিনের পাতা-খসানো গাছে গাছে বৈশাখে যেমন কচি কচি পাতায় পাতায় সমস্ত গাছগুলি ঝলমলিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি মুখুজ্জ্যে-কর্ত্তার ফাঁকা বাড়ী-ঘর বছরের শেষ নাগাদ প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের আগমনে আনন্দে গম্ গম্ করতে থাকে।

চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ সেবার শেষ হয় হয়—

আর এদিকে শ্রীকণ্ঠপুরে পীতাম্বর মুখুজ্জ্যের বাড়ীতে বিদেশ থেকে ছেলে মেয়েদের ক্রমান্বয়ে আগমন সুরু হয়ে যায় এক একটি করে। এ বছরে প্রথমে এসে উপস্থিত হলো মেজ ছেলে পরেশচন্দ্র সপুত্র-পরিবারে। খানিকটা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলে খুব কম। হাসি-তামাসায় যোগ দেয় ওজন বুঝে। তার তিন মেয়ে—ঝর্ণা, অপর্ণা ও শ্রীপর্ণা আর দু'ছেলে—প্রশান্ত ও সুশান্ত।

সেদিনই সন্ধ্যের দিকে এলো সেজ ভাই সুরেশচন্দ্র। ওর সবেধন নীলমণি ছেলে বীরেশ্বর এবং দু'টি মেয়ে, ভানু ও মেরী। স্বভাবে সুরেশচন্দ্র ঠিক মেজ ভাইয়ের বিপরীত। অতি সহজ সরল আপন-ভোলা মানুষ। কিন্তু খুব জেদী। সারা বাড়ী খানা সকল সময় তার হাসি-গল্পের দাপটে গম্ গম্ করতে থাকে। যত রাজ্যের গল্প আজগুবি খোসগল্প তার মুখে মুখে ফিরছে যখন-তখন।

তার পরের দিন সকালে বেলা দশটায় হাজির হলো বড়ো ভাই গণেশচন্দ্র। ভীষণ ধর্ম্মভীরু লোক। বি-এ পাস করেও টিকি রেখেছে। সকাল-সন্ধ্যা পূজা-আহ্নিক না করে একবিন্দু জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। বিজয়, বিকাশ ও রমেশ ওর তিনটি ছেলে ; আর মা-বাপের চোখের মণি মেয়ে শোভা। তারাও এসেছে সঙ্গে।

এবং একই দিনে দুপুরের গাড়ীতে, পীতাম্বর মুখুজ্জ্যের তিন মেয়েই পরস্পর চিঠি লেখালেখি করে, দিন স্থির করে এসে উঠলো বাপের বাড়ীতে। বড়োর একটি মাত্র মেয়ে—দীপা ; মেজর দু' মেয়ে—রীণা, লীলা, আর একটি ছেলে অনিলবরণ ; এবং ছোট মেয়ের দু' ছেলে—অমল ও কমল ; একটি মেয়ে মিনি। প্রতি বছরের মত ওরাও আসতে ছাড়েনি মায়ের পিছু পিছু।

আরো একটা দিন বাদে উপস্থিত হলো ন' ভাই সুকেশ সস্ত্রীক এবং দু'টি ছেলে সুজন ও রঞ্জন সঙ্গে। সুকেশ চেহারায় বেশ সুপুরুষ। দেহের প্রতিটি পেশী ওর সুদীর্ঘ দিনের ব্যায়াম-চর্চ্চায় রীতিমতো সুগঠিত। মনও শিশুর মতন সরল। কথায়-বার্ত্তায় ও প্রায় যায় ওর সেজ ভাইয়ের পাশাপাশি। অর্থাৎ একবার মুখ খুললে, কারুর পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি স্থির থাকবার যোটি নেই—ভীষণ—রগুড়ে !

অবশিষ্ট ভাইদের মধ্যে, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আরো এসে পৌঁছালো ওদের ফুল-ভাই কুমারেশ। অর্থাৎ পীতাম্বর মুখুজ্জ্যের পঞ্চম সন্তান। সকল কথায় অভিনয়ের ঢঙে শিশির ভাদুড়ীর মতন হাত পা ছুড়ে, রঙ দিয়ে, রস-সহযোগে কথা বলা অভ্যেস। আরেকটি ওর মুদ্রাদোষ হলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মাথায় অকারণে গাঁট্টা মেরে কাঁদানো। নিজের ছেলে-মেয়ে অণু, গপু আর বিনু কারুর পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের মতন ঠুকঠাক পড়ছেই যখন-তখন।

তারপর ষোলকলা পূর্ণ হলো আরো দুটো দিন বাদে—যেদিন ওদের নতুন ভাই স্বদেশ এসে গেল বাড়ীতে। ভাইদের মধ্যে স্বদেশেরই উপার্জ্জন মোটামুটি গোছের। প্রচুর আয় ওর যেমন, তেমনি অত্যধিক ব্যয় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। ঠিক বাপের মতন ধাঁচ পেয়েছে ওর ছেলেটি ও মেয়েটি—সোমনাথ আর প্রতিমা।

মজার ঘটনাটি ঘটলো, যেদিন স্বদেশ এসে বাড়ী ঢুকলো।

সপরিবারে গেট পেরিয়ে নতুন ভাইকে আসতে দেখে, বাগানে কি একটা কাজে ব্যস্ত সুরেশ উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠলো, চীৎকারে সারা বাড়ী সচকিত করে বললে, "ওরে কে কোথায় আছিস শীগগির ছুটে আয় সবাই। স্বদেশবাবু বিদেশ থেকে স্বদেশে এসে পৌঁচেছে।"

সুরেশের ঘন ঘন হাঁক-ডাকে ছেলেমেয়েরাও দলে দলে 'নতুন কাকু' 'নতুন কাকু' আওয়াজে বাড়ী মাথায় করে পঙ্গপালের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে

উপস্থিত হলো বাগানে। চোখের পলকে নতুন কাকা মৌচাকের মতন ঢাকা পড়ে গেল মধুলোভী মৌমাছিদের সমাবেশে। কাকার সঙ্গে কাকিমাও।

ছেলেমেয়েদের এমনি করে ছুটে এসে কাকাকে ঘিরে ধরার একটি লোভনীয় কারণ আছে অবশ্যই। প্রতিবারেই তাদের নতুন কাকা যখনি বাড়ী আসে, হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আসে তাদের জন্যে। নতুন কাকার নাম কাণে যাবা মাত্রই তারা ধরে নিয়েছিল যে, এবারেও সে-ঘটনার অন্যথা হবে না নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে একটি মিষ্টির হাঁড়ি খুলে স্বদেশ এক একটি ইয়া-ইয়া রাজভোগ এক একজনকে বিতরণের উদ্যোগ করছিল। সুরেশ ভীড় ঠেলে-ঠুলে ভিতরে ঢুকে, চিলের মতন ছোঁ মেরে স্বদেশের হাত থেকে তুলে নিল মিষ্টির হাঁড়িটি। বললে, "স্বদেশ, সারা রাত জেগে ট্রেণে এসেছ, যাও, জিরোও গিয়ে। শিশু অর্থাৎ নারায়ণ-সেবার পুণ্যিটা এই মহাপাপীর হাত দিয়েই হোক, কী বলো?"

স্বদেশ মুচকি হেসে ভীড় এড়িয়ে বেরুবার চেষ্টা করতে লাগলো।

মেজ ভাই পরেশের পাঁচ-বছরের মেয়ে শ্রীপর্ণা সাগ্রহে ডান হাতখানা বাড়িয়ে আবদারের সুরে বললে, "চব ফুরিয়ে তাবে যে সেজ কাকু—আগে তা দাও আমাকে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। নাও, তুমি একটা নাও।" শ্রীপর্ণার হাতে একটি রাজভোগ তুলে দিয়ে সুরেশ কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললে, "অসভ্য জংলীর দল, কিউ দিতে এয় জানোনা। দাঁড়াও, কিউ দাও।"

"কাকু, আমি বাজারে—"

"চুপ রও, কানুনসে লেনা চাহিয়ে।" সুরেশ চাকরী করে লক্ষ্ণৌতে। তাই হিন্দী বলা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলা মুল্লুককেও মনে করে লক্ষ্ণৌ শহর বুঝি। এবার বাংলাতেই বললে, "আচ্ছা পাঁচ-ছ' বছর্ পর্য্যন্ত যাদের বয়েস, একটা আলাদা লাইনে সবাই দাঁড়াও। তারা এখুনি পাবে রাজভোগ। বাকী সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে—প্রস্তুত হও সব।"

বীরু, ভানু, মেরী, গপু, বিনু, অমি, সমু আর মিনির দল সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো, "কিসের প্রতিযোগিতা? কিসের প্রতিযোগিতা?"

সুরেশ চীৎকারে বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে, চোখ বুজিয়ে, মুখ বিকৃত করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কৃত্রিম ধমকের সুরে বললে, "থাম বাপু, সব থাম দিকিনি। চীৎকারে তোদের বিদেশী রাষ্ট্ররা মনে করবে, শান্তিকামী নেহেরুর ভারতবর্ষ বোধহয় আণবিক বোমা পরীক্ষা করছে গোপনে!"

কখন এক সময়ে সুকেশ এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরেশের ন'ভাই। সুকেশ

বললে, "বালকবালিকাবৃন্দ, আমার পাশাপাশি সকলে কিউ দিয়ে দাও। নাও, সেজদা, দিতে সুরু কর দিকিনি চট্‌পট্‌।"

আশে পাশে প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুরেশ বললে, "শোনো তোমরা। যাও দিকিনি, আমাদের বাড়ীর সীমানার মধ্যে থেকে সব চেয়ে দামী জিনিসটি যে আগে আনতে পারবে—সে-ই পাবে প্রথম পুরস্কার। অর্থাৎ দশটি রাজ-ভোগ। বাকী সকলে একটি করেই পাবে। আধঘণ্টা মাত্র সময় দিলাম। যাও সব।"

বৈঠকখানায় এসে একটি চেয়ার দখল করে বসে, সমস্ত ভাই-বোনেদের এবং বাপ-মাকে ডেকে আনালো সুরেশ। পীতাম্বর মুখুজ্জ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু শুনে হেসেই অস্থির। যখন মুখুজ্জেমশায় হেসে হেসে অন্যান্য ছেলেদের কাছে সুরেশের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করছিলেন, এমনি সময়ে বড়ো ভায়ের বড়ো ছেলে বিজয় দাদামশায়ের বিরাট টিনের তোরঙ্গখানা মাথায় করে এসে হাজির হলো প্রতি-যোগিতাক্ষেত্রে। সেটা মাথা থেকে নামিয়ে বিজয় বললে, "দাদুর বাক্সে অনেক টাকা আছে, সেজ কাকু। সব চাইতে এটাই মূল্যবান—দিন, আমাকে প্রথম পুরস্কার দিন।"

পীতাম্বর মুখুজ্জ্যে কী যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, ঘরে ঢুকলো মেজ ভাই পরেশের বড়ো মেয়ে ঝর্ণা। স্কুল-ফাইনালের পরীক্ষার্থিনী। শাড়ীর আড়াল থেকে মায়ের গলার ভরি তিনেক ওজনের সোনার নেক্‌লেসটি বার করে ও বললে, "মায়ের এই হারছড়াটাই সব থেকে ভ্যালুয়েবল, সেজ কাকু। ফার্ষ্ট প্রাইজটি আমারি প্রাপ্য—তাই-না, কাকু ?"

"থাম, থাম। সকলে আগে কে কি আনে আনুক দেখি। তারপর বিচার।" ধমকের সুর টেনে বললে সুরেশ। এবার ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে সুরেশ আবার বললে, "ঝর্ণা যাও, বিজয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। বাকী সকলে এলেই, দেখে শুনে তবে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে—কী বলেন, বাবা ?"

"ঠিকই তো, ঠিকই তো।" মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিয়ে বললেন পীতাম্বর মুখুজ্জ্যে, "সকলের দেখেই বিচার করাটা ভাল কাজ হবে। ঠিক বলেছ।"

মিনিট দুয়েক পরে, বড়ো ভায়ের মেয়ে শোভা আর মেজ বোনের মেজ মেয়ে লীলা দু'টিতে ধরাধরি করে তাদের অল ওয়েভ রেডিও সেটটি নিয়ে প্রবেশ করলো এ-ঘরে। কুমারেশ, সুরেশের ফুল-ভাই তাই না দেখে, রেগে মেগে ছুটে গিয়ে সেটা ছিনিয়ে নিলো ওদের হাত থেকে বিদ্যুৎবেগে। তেমনি রাগত কণ্ঠস্বরে কুমারেশ বললে, "দাদার যেমন এক ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা ! ছেলেমেয়েগুলো ঘরের দামী দামী জিনিসগুলো এবারে ভেঙে-চুরে তচনচ করুক !"

সুরেশ নির্ব্বিকার চিত্তে হুকুম করলো কুমারেশকে, বললে, "ভাই কুমার, যাও

ওটা ওই তোরঙ্গের ওপরে রেখে দাও।" তারপর শোভা ও লীলার প্রতি আঙুল

নির্দ্দেশ করে পুনরায় আদেশের সুরে বললে, "দু'জনে তোমরা গিয়ে ক্ষণার পাশে দাঁড়াও।"

আধঘণ্টা শেষ হতে বাকী মাত্র মিনিট তিন-চার।

ইতিমধ্যে পুরস্কারের লোভে ছেলে মেয়েরা, বাবার ওমেগা হাতঘড়ি, মায়ের আঙুলের হীরেবসানো আংটি, ঠাকুদ্দার দলিল-দস্তাবেজের হিমালয় প্রমাণ বাণ্ডিল—অমনি ধরণের রাশিকৃত জিনিসপত্রে প্রায় ভরিয়ে ফেলেছে বৈঠকখানার মেঝেটুকু।

হাতঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে সুরেশ মুখ তুলতেই দেখলো, ঘরে আসছে তার ছোটবোনের ছোট মেয়ে মিনি, মায়ের হাতখানি ধরে টানতে টানতে নাচতে নাচতে।

চোখ দুটি ঈষৎ বড়ো করে, মিটিমিটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে সুরেশ পরম স্নেহ ভরে প্রশ্ন করলো, বললে, "মিনি মণি, তুমি কই কিচ্ছু আনলে না?"

"হ্যাঁ, এনেছি তো, মামু।" মিনি ডানদিকে মাথা কাৎ করে উত্তর দিল। একটু থেমে ও ফের বললে, "মায়ের চাইতে কিছু মূল্যবান জিনিস নেই, মামু। মাকে তাই তো ধরে এনেছি।"

সুরেশ হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নিলো মিনিকে। কিছুক্ষণ আদর করে, ওর নরম তুলতুলে গালে পর পর কয়েকটি চুমু খেয়ে সহাস্যে বললে, "সবাই শোনো। আর নিশ্চয়ই কারুর কিছু আনতে বাকী নেই।" মুহূর্তকাল চুপ থেকে সুরেশ তেমনি হাসতে হাসতে পুরস্কার ঘোষণা করে বললে, "প্রতিযোগিতায় মিনি রাণীকেই দেওয়া গেল প্রথম পুরস্কার। কী বলেন বাবা—বড়দা?"

বৃদ্ধ মুখুজ্জ্যেমশায় দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে একগাল হেসে বললেন, "তা-হলে মিনির বাজীমাৎ। বেশ হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। সত্যিই তো, মানুষের পরম কাম্য স্বর্গের চেয়েও তো বড়ো জননী। ঠিক বলেছে মিনি।"

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে সমর্থন জানালো সুরেশের বিচার-ব্যবস্থা—এবং অতটুকু মেয়ের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের প্রশংসায় ধন্যি ধন্যি করতে লাগলো সকলেই। মিনি ততক্ষণে বিরাট এক কামড় বসিয়ে দিয়েছে ডান-হাতে ধরা রাজভোগে। কী মিষ্টিই না লাগছে!

এদিকে বাকি ছেলেমেয়েদের চোখগুলো হয়ে গেছে যেন আমড়া আঁটিটি। আর মুখগুলো যেন অবিকল এক একটি বাংলা পাঁচ।

তারপর—তারপর কী জানো? সেই ইয়া-ইয়া রাজভোগের নাম শুনে তো জিভে জল ঝরতে সুরু করেছে একজনের! কিন্তু নামটি তার কিছুতেই বলছি না। তবে অনেক দূরে থেকেও আমি পি, সি, সরকারের ম্যাজিকের মতন তোমাদেরকে দেখাতে পারি, যার নোলায় জল পড়ছে টপ্ টপ্—একটি ফুস্‌মন্তরে। যদি চাক্ষুষ তাকে সত্যিই দেখতে চাও, একবার আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়াও না। দাঁড়াও।

● মণিমুক্তা

পণ্ডিতদের অনেকে বলেন পাপ-পুণ্য শুধু মানসিক বিকার—এ পৃথিবীতে পাপ-পুণ্য বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। মানুষ তার সুবিধার জন্যে, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-অসত্য এই কথাগুলোর সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এর উত্তরে আমি বলব, আমরা যখন কোনও কাজে অগ্রসর হই, তখন কখনও পাই বিবেক আর মনের সমর্থন, আবার কখনও মনের মধ্য থেকেই আসে বাধা। আমি এটাকে শুধু সংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই না—তাহলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে ধর্ম্ম আর সত্যের জয়ধ্বজা উড়ত না!　　　　—জি. কে. চেষ্টারটন

ইস্কাবনের টেক্কা

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

[**পূর্ব্বকথা**। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে ছিল অনিতা সেন; টাইপিষ্টের কাজ করে সংসার চালাতো। একদিন অফিসের সেক্রেটারী দামোদর ভট্টাচাজ্যির অনুরোধে একটা 'ইস্কাবনের টেক্কা' নকল করে দেয়। পরে অনিতা জানতে পারে, ঐ ইস্কাবনের টেক্কা প্রখ্যাত ডাকাতদলের প্রতীক চিহ্নস্বরূপ। কারুর মৃত্যু-পরোয়ানা দেবার সময় ঐ ইস্কাবনের টেক্কা তারা ব্যবহার করে। অনিতা ভাবে, পুলিশের কাছে সব কথা জানাবে। তার আগে দামোদরবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। কিন্তু কথা বলা হয় না। অফিসে এসে সে শোনে, দামোদরবাবু খুন হয়েছেন।

সহকারী সেক্রেটারী অনিলবাবু এবং আরও দুজন সহকর্ম্মীর সঙ্গে অনিতা যায়, লাশ সনাক্ত করতে। ফেরবার সময় শ্যামবাজার পর্য্যন্ত তারা ট্যাক্সিতে ফেরে। সেখানে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হয়। পাঞ্জাবী ড্রাইভার বিনা ভাড়ায় অনিতাকে বাসায় পৌঁছে দিতে চায়। কিন্তু অনিতা রাজী হয় না। পাড়ায় ফিরে অনিতা দেখে একটা চায়ের দোকানে সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার রাস্তা জুড়ে গাড়ী রেখে কি যেন করছে। কোন দুরভিসন্ধি আছে ভেবে পাড়ার ছেলে অবিনাশের কাছে আশ্রয় নেয়। অবিনাশ দলবল নিয়ে বাধা দেয়—ফলে সেখানে মারামারি শুরু হয়। পাঞ্জাবীরা বেপরোয়া হয়ে গুলি চালায়। পুলিশ আসে। পাঞ্জাবীদের ধরে নিয়ে যায়। তদন্তে এসেছিল সাব ইন্‌স্পেক্টর শৈলেশ। সবকিছু ঘটনা দেখে অনিতাকে পাহারা দিতে সে থানা থেকে পুলিশ পাঠাবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর ইন্দুবাবুকে বলে। কিন্তু ইন্দুবাবু রাজী না হওয়ায় শৈলেশ নিজের দায়িত্বে অনিতাকে পাহারা দেবার জন্য অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যায়। ওপরওলার নির্দ্দেশে সাব্-ইন্‌স্পেক্টর নীরোদবাবুকে অনিতার পাহারায় পাঠাতে হয় ইন্‌স্পেক্টর ইন্দুবাবুকে। খানিকক্ষণ পরে নারোদবাবু ফিরে এসে খবর দেন যে, অনিতাকে চুরি করবার মতলবে সেখানে এক ডাকাতদল হানা দেয়। শৈলেশ আর অবিনাশের চেষ্টায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ডাকাতির পর সাব্-ইন্‌স্পেক্টর শৈলেশবাবুকে আর পাওয়া যায়নি

শৈলেশবাবু ডাকাত-দলের পিছু নিয়েছিলেন তাদের আড্ডার সন্ধানের জন্তে। আড্ডার কাছে এসে তিনি দেখতে পেলেন একতলা একটি বাড়ী। একটা ঘরে লণ্ঠন-হাতে একটি লোক জানলার দিকে পিঠ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে মুখটা একটু ফেরাতে শৈলেশবাবু তাকে চিনতে পারলেন—দামোদর ভটচাজ্যির লাশ সনাক্ত করতে যারা এসেছিল এ তাদেরই একজন! কি যেন ওর নাম ?]

পাঁচ

অনিতার বাড়ীতে ডাকাত পড়ার পরই তাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, সকাল হ'তেই বাড়ীতে তাকে রেখে গেল আবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে বেলা দশটায় লালবাজারে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ডেপুটী সাহেবের কাছে। নিয়ে যাওয়া এবং পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশেরই, একা রাস্তায় বেরুনো তার পক্ষে যে বিপদের কারণ হতে পারে, এটা সবাইয়েরই এখন মাথায় এসে গিয়েছে।

যথাসময়ে লালবাজারে পৌছালো অনিতা।

মাত্র পরশু দিন! এই পরশু দিনই সকালবেলায় সে ভাবছিল—পুলিশের কাছে সে যাবে কি যাবে না। ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বেচারীর। তবু সে কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে নি। আজ তাকে সেই পুলিশের কাছেই আসতে হয়েছে। ঘটনাচক্র তাকে বাধ্য করেছে আসতে। এ-আসার পরিণাম শুভ হবে কি অশুভ হবে, জানেন শুধু ভগবান্।

ভয় কিন্তু সে পেয়েছে, নিদারুণ ভয়! তার নিজের উপর এই আক্রমণ, একই রাত্রে দুইবার! এর মানে কী? কারা তাকে সরাতে চায়? কেন সরাতে চায়? তার অর্থ নেই, এমন-কিছু অন্যায়ও জীবনে সে করেনি।

তবে?

• • • • •

ডেপুটী সাহেবের প্রথম প্রশ্নেই সে অবাক্ হ'ল।

"অনিলবাবু, হীরেনবাবু, সমরেশবাবু—এঁদের সঙ্গে কাল কখন তোমার ছাড়াছাড়ি হয়? কোথায়?"

যথাযথ উত্তর দিতে-না-দিতেই আরও প্রশ্ন। আরও! আরও! অগুণ্তি!

"তাঁরা তিনজনে মিলে রাত্তিরবেলায় কোথাও যাবার মতলব করেছিলেন ব'লে জানো তুমি?"

"আজ্ঞে না।"

"তাঁদের কেউ জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গুম করতে পারে—এমন ধারণা তোমার হয় কি?"

"সে কি! না।"

"তোমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে চাইছিল যারা, তাদের কোন পরিচয় তুমি জানো কি?"

"না। ঐ ড্রাইভারটাকে আগে কখনো দেখিনি; তার পিছনে অন্য লোক কেউ আছে কি না, তাও জানিনে।"

"না থাকলে রাত্রে তোমার বাড়ীতে চড়াও হ'ল কারা? ড্রাইভার ত' তখন হাজতে!"

"আমি বুঝতে পারছিনে। একটা ড্রাইভার মাত্র, তার দলে কত লোক থাকতে পারে? আর দল সে গড়লই বা কখন? মানে, আমাকে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই যদি দল সে গ'ড়ে থাকে, তবে ধ'রে নিতে হয়—সে আমাকে আগেই চিন্ত।"

"অসম্ভব কি? কিন্তু সে কথা পরে হচ্ছে। আপাততঃ ধ'রে নিতে হবে যে দল একটা আগে থেকেই ছিল। সেই দলই অনিলবাবুদের তিনজনকে ধ'রে নিয়ে গুম ক'রে রেখেছে, এটা কি তোমার সম্ভব মনে হয়?"

"আমি বুঝতে পারছি নে কিছুই। আমায় গুম করবার চেষ্টাই বা কেন হ'ল, অনিলবাবুদের গুম করবারই বা কারণ কী থাকতে পারে, কিছুই জানিনে যখন—"

"শৈলেশবাবু কোথায় গেলেন, কিছু অনুমান করতে পার কি?"

"অনুমান না ব'লে আশঙ্কা বলুন। আমার ত' মনে হয়, তিনি ওদের হাতে মারা গিয়েছেন। বেচারী!"

হঠাৎ দারুণ চমকে উঠল অনিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবিস্ময়ে তার দিকে

তাকালেন ডেপুটী সাহেব। সে উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠল—"ঐ না—ঐ না অনিলবাবু? ঐ ঘরে কথা কইছেন?"—পাশের ঘরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করল অনিতা।

"ঐ ঘরে?"—অনিতার চাইতে বেশী বিস্ময় ফুটে উঠল ডেপুটী সাহেবের কথার স্বরে। টেবিলের উপর থেকে একখানা কার্ড চোখের সামনে তুলে ধ'রে তার নামটা ভাল ক'রে পড়লেন তিনি। অনিতার স্মরণ হ'ল—একটু আগে চাপরাশি ঠিক ঐ ফিকে সবুজ রংয়ের কার্ডখানাই এনে সাহেবকে দিয়েছিল, এবং সাহেব তাকে হুকুম দিয়েছিলেন—'বাবুকো ওয়েটিং কামরামে বৈঠাও।'

বাবু ওয়েটিং কামরাতেই বসেছেন, এবং তিনিই কথা কয়েছেন। বেশ রাগত-স্বরেই ব'লে উঠেছেন—"দেখো চাপরাশি, কেৎনা ঘড়ি মেরা বৈঠনে হোগা, কুছ বোলা সাহাবকো মেরা টাইমকো দাম ত হ্যায় থোড়া বহুৎ!"

এবং সেই কথা শুনেই অনিতা চমকে ব'লে উঠেছে—"ঐ ত! ঐ ত অনিলবাবু!"

খুব চুপি-চুপি ডেপুটী সাহেবের সঙ্গে অনিতার কথা হ'ল দুই একটা। তারপর সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে অনিতাকেও ইসারা করলেন উঠে আসতে। ডান দিকের খোলা দরজা দিয়ে অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করলেন অনিতাকে নিয়ে। এ হ'ল সাহেবের খাস কামরা, এখানে তিনি টিফিন করেন, কখনো-সখনো দু'পাঁচ মিনিট বিশ্রামও করেন সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে। এই কামরার দেয়ালে কোথায় যেন কী একটা সুইচ্-জাতীয় জিনিস টিপলেন সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে একদিকে একটা সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিল দেয়ালের গায়ে। তাতে প্রথমে চোখ রাখলেন সাহেব নিজে। প্রায় মিনিট-খানেক তাকিয়ে থেকে তিনি স'রে গেলেন, এবং অনিতাকে ইসারা করলেন ফাটলে চোখ রাখবার জন্যে। কানে কানে ফিসফিস ক'রে তাকে বললেন—"ভাল ক'রে লক্ষ্য কর; বেশ ক'রে দেখ লোকটিকে। কথা কয়েছিলেন এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, অথচ তুমি বলছিলে—ইনিই অনিলবাবু। ভাল ক'রে দেখ! এও কি সম্ভব যে ইনিই ছদ্মবেশী অনিলবাবু?"

নাঃ, কোনমতেই সম্ভব নয়! অন্ততঃ অনিতার ত' তাই মনে হয়। এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী, মাথায় রঙ্গীন সিল্কের প্রকাণ্ড পাগড়ী, গালে গালপাট্টা দাড়ি, নাকের নীচে কাইজারী গোঁফ! চোখে নীল চশমা, মুখে মোটা চুরুট। নীল সাটিনের পায়জামা এবং হলদে সিল্কের পাঞ্জাবী প'রে ভদ্রলোকের চেহারা খুলেছে থিয়েটারের হিরোর মত। তার উপর আবার কাঁধের উপর দিয়ে পৈতের আকারে ঝোলানো মিশ-কালো রংয়ের একটা ব্যাজ, তাতে বাঁকা কিরপাণ একখানা এক হাত লম্বা। রীতিমত সৌখীন মিলিটারি সাজ!

কিন্তু অনিলবাবুর পক্ষে কি এ-রকমটা সেজে আসা সম্ভব? তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ঠিকরে বেরুবার মত হ'ল অনিতার।

নাঃ! গায়ের রং ছাড়া আর কিছুই মেলে না অনিলবাবুর সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে দেখে তারপর বোকার মত হেসে অনিতা তাকাল ডেপুটী সাহেবের দিকে। তিনি মাথা নেড়ে ইসারায় প্রশ্ন করলেন—"নয়?"

অনিতাও মাথা নেড়ে জানাল—"না।"

"কিন্তু, তবু, গলার আওয়াজ ঠিক অনিলবাবুর মত? এতে ভুল নেই কিছু? ভেবে দেখ

বেশ ক'রে। তোমার ব্যাপারটা এর উপর অনেকখানি নির্ভর করতে পারে হয়ত।"—ফিসফিস ক'রে বললেন ডেপুটী।

ঠিক তেমনি স্বরেই বললে অনিতা—"আমি আজ দেড় বছর দৈনিক শুনছি অনিলবাবুর গলা। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি—এ-লোকটির গলার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই।"

তারপর অনিতাকে ছুটি দিলেন ডেপুটী সাহেব।

অফিসঘরে ফিরে এসে পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন। কার্ডে নাম আছে হরদিৎ সিং জালেন্ধরওয়ালা। ইণ্ডো-আমেরিকান ইম্পোর্ট কোম্পানী এবং আরও আরও বহু কোম্পানীর ডিরেক্টর; কোন কোন কোম্পানীর আবার একমাত্র স্বত্বাধিকারীও।

ইণ্ডো-আমেরিকান ইম্পোর্ট হ'ল দামোদর ভট্‌চাজ্যির কোম্পানী।

বাংলাতেই আলাপ সুরু করলেন জালেন্ধরওয়ালা। একটু বিদ্‌ঘুটে উচ্চারণ তাঁর বাংলার; তা নইলে আর কোন দোষ নেই। বললেন—

"হামাকে কেনো ডাকিয়েছেন স্যার? বহুৎ কাজ হামার, আধ ঘণ্টা টাইম নোষ্টো হোলে ভোয়ানোক ব্যেপার হোয়।"

"কী করা যাবে বলুন—" ডেপুটী সাহেব আপশোষের সুরে বললেন—"সরকারী কাজ, দেশের আইন-শৃঙ্খলার নামে আপনাকে ডাকতে হয়েছে। আপনার অসুবিধার জন্যে আমি দুঃখিত। কথাটা কী জানেন, ইণ্ডো-আমেরিকান ইম্পোর্ট কোম্পানীর খাতাপত্রে দেখছি—আপনি ওখানকার একজন ডিরেক্টর।"

তালুতে জিভ ঠুকে হতাশার আওয়াজ বা'র করলেন জালেন্ধর। "বোলেন কেনো। বহুৎ বহুৎ রুপেয়া ডুবলো স্যার। ঐ দামোদরবাবু, হামার দালাল ছিলো। ইম্পোর্ট কোম্পানী খোল্‌তে চাইলো; হামিও বুঝলোম—কাজ ভালোই চোলতে পারে। নামেই লিমিটেড, রুপেয়া প্রায় সবই হামারি ছিলো। ডর কিছু ছিলো না, নাফাই হোতো। লোকটা খুন হোয়ে গেলো, কেয়া কিয়া যায়। ডুবলো!"

"কেন? দামোদরবাবুই খুন হয়েছেন, আরও ত' লোক আছে আফিসে! তারা কাজ চালাতে পারবে না?"—জিজ্ঞাসা করলেন ডেপুটী সাহেব।

"পারবে কি না পারবে। হামি তা কেমোন কোরিয়ে জানবো স্যার? হামি থোড়াই চিনি তাদের। আফিসে হামি দুই চারবার গিয়েছি; কিন্তু সে সোন্ধ্যার পর। কমিটির মিটিং সোন্ধ্যার পরই হোয়। ও-টাইমে দামোদর ছাড়া আফিসের ঔর কেউ থাকতো না সেখানে।"

"বলেন কি? অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারিও না?"—জিজ্ঞাসা করলেন ডেপুটী।

"অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি?"—চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন জালেন্ধর। "অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি আবার ছিলো না কি হামাদের? হামি স্যার, দামোদর ছাড়া ঔর কাউকে চিন্‌তোম না, কোনোদিন কাউকে দেখিও নাই। কিন্‌টু হামার ঔর-বি কাম আছে, একটু তাড়াতাড়ি হামাকে ছুটি দিবেন স্যার।"

"অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির কথাটা তুলেছিলাম এইজন্য যে দামোদরবাবু খুন হওয়ার পর পিঠ-পিঠই অনিলবাবুও নিরুদ্দেশ হয়েছেন। অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি অনিলবাবু।"

"নিরুদ্দেশ হোয়েছে? তোবে ত সেই শালাই খুন করিয়ে থাকবে স্যার! কাজ ত সাফা হোয়ে গেলো।" উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন জালেন্ধর। "ঐ লোকটাকে পাক্‌ড়ান—ব্যস্!"

এমন পরিপূর্ণ স্বস্তির সুরে 'ব্যস্' কথাটি উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক, মনে হ'ল খুন এবং অন্য সব ঝামেলার কিনারা হয়েই গিয়েছে। ডেপুটী সাহেবের ঠোঁটের কোণে এক মৃদু হাসি চকিতের মত খেলে দিয়ে গেল একটিবার, তারপর তিনি কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নীরস ক'রে বললেন—"অনিলবাবু খুন করে থাকুন বা না থাকুন, তাঁকে খুঁজে বার করবার দরকার অবশ্যই আছে। তিনি আবার একা নন, তাঁর সঙ্গে আছেন আপনার আফিসের আরও দু'একজন কর্মচারী।"

"বোলেন কি?"—জালেন্ধরওয়ালা আরও উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন—"বোলেন কি? তোবে ত এ দোস্তুরমাফিক গ্যাং কেস্! খুঁজুন স্যার, খুঁজুন! হামার ত বিশোয়াস—ঐ দো-তিন আদমি পাকড়া গেলে গোলমালের ফোয়সালা হোবে।"—বলতে বলতেই চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে জালেন্ধরওয়ালা উঠে দাঁড়ালেন—"হামার বোহুৎ জরুরী কাজ আছে স্যার, টেলিফোন নোম্বর কার্ডে আছে, রিং কোরলেই হামাকে পাবেন।"

"একটু, একটু বসুন!"—ডেপুটী সাহেব বিরক্তি চেপে মিষ্টস্বরেই বললেন—"আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। দামোদরবাবুর নিজের সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? আপনার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ যখন, লোকটির পয়সাকড়ি কী-রকম ছিল, স্বভাবচরিত্রে কোন দোষ ছিল কি না—"

"হামি তা কেমোন করিয়ে জানবো?"—রাগতভাবেই জবাব দিলেন জালেন্ধর। স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে। "হামার দালাল ছিলো; ও-রকম দালাল হামার পঁচাশটা আছে। স্বোভাব-চরিত্রো কার কী রোকম, পঁচাশটা লোকের খবোর হামি কী-রোকমে রাখবো? আর রাখবোই বা কেনো? হামার সাথে কাজ লিয়ে সম্পর্কো ওদের। কাজ যে ভালো কোরবে, সে মদ খাক, সে রেস খেলুক—"

"ঠিক, ঠিক"—ডেপুটী নিজের রাগটা হজম ক'রে আগের মত মিষ্টি সুরেই বললেন—"কিন্তু টাকাকড়ি? টাকাকড়ি তাঁর কেমন ছিল?"—খানিকটা হাঃ হাঃ করে হাসলেন ডেপুটী সাহেব। "বলি, তাঁর কাছে ইস্কাবনের টেক্কা-মেক্কা এসেছিল, বলতে পারেন? খুনটা ইস্কাবনের টেক্কার দল করেছে কিনা, সেটাও বোঝা দরকার!"

জালেন্ধরওয়ালার চক্ষু চড়কগাছ। "হাপ্‌নি বোলেন কি মোশায়? ইস্কাবোনের টেক্কা দামোদরের কাছে? যে-আদ্‌মি এক শোও টাকা দোরকার হোলে হামাকে টেলিফোন কোরত ধারের জোন্যো?"—জালেন্ধর হাসি চাপতে পারলেন না, ডেপুটীর চাইতেও জোরে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

"ঠিক, ঠিক,"—সে হাসিতে যোগ দিয়ে সাহেব বললেন—"কথাটা হাসিরই হয়েছে বটে! কিন্তু, দামোদর মরুক গে, আপনার ত' টাকার লেখাজোখা নেই, কিন্তু কই, আপনার কাছেও ইস্কাবনের টেক্কা এখনও এলো না! সাতাশি জন ইস্কাবনের টেক্কার দাবি মিটিয়েছে নগদ টাকা দিয়ে, আর পঁচিশজন সে দাবি মিটিয়েছে জীবন দিয়ে। কোন লিষ্টিতেই ত' আপনার নাম ওঠে নি।"

উঃ! এবারকার হাসির দমকে গোটা লালবাজার ফেটে পড়বার মত হ'ল। জ্বালেন্দ্ররওয়ালা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, হাসতে হাসতে ব'সে পড়লেন। তারপর—

তারপর হলদে সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে টেনে বার করলেন মোটা একখানা সাদা খাম। "দেখুন সাহেব!"—ব'লে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জ্বালেন্দ্ররওয়ালা খামখানা ফেলে দিলেন ডেপুটীর সমুখে।

জ্বালেন্দ্ররের ভাবভঙ্গীতে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছিল সাহেবের, তবু তিনি হাসিমুখে খামখানা তুলে নিলেন। তা থেকে বেরিয়ে পড়ল—

কেউটে সাপ বেরিয়ে পড়লেও সাহেব এত বিচলিত হতেন না। বেরিয়ে পড়ল একখানা ইস্কাবনের টেক্কা।

উল্টে পাল্টে দেখলেন সাহেব!

ছাপানো টেক্কাই বটে, হাতে-আঁকা নয়।

আর, খামের উপর ডাকঘরের ছাপ সেদিন সকালেরই।

"আজই এসেছে!" জ্বালেন্দ্ররওয়ালার হাসি তখনো থামেনি, একটু কমেছে মাত্র। "এ লাখ টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে হালিসহরে গঙ্গার ধারে ভূতুড়ে বোটগাছের তলায় পাঠাবার ব্যবস্থা কোরতে হোবে বোলেই এতো তাড়াতাড়ি কোরছি স্যার!"

বেরিয়ে পড়ল একখানা ইস্কাবনের টেক্কা।

[ক্রমশঃ

যার কোনো মানে নাই

—পণ্ডিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেরই মাঝে আছে পাওয়া যায় খুঁজ্‌লে !
শক্ত যা সোজা হয় মানে তার বুঝ্‌লে ॥
মানে আছে রূপে, রসে, বর্ণে ও গন্ধে ।
মানে আছে মিলে আর গরমিলে, দ্বন্দ্বে ॥
তত মানে আছে যত আওয়াজ বা শব্দ ।
তারও মানে আছে যত নীরব ও স্তব্ধ ॥
মানে আছে চেহারায়, পোশাকে ও সাজেও ।
মানে আছে ইশারায়, মানে আছে কাজেও ॥
হাস্‌লেও আছে মানে, কাঁদ্‌লেও, হাঁচ্‌লেও ।
গানেরও যেমন মানে, তেম্‌নি তো নাচ্‌লেও ॥
মানে নাই এমন এ পৃথিবীতে কই রে ?
পড়ার বইয়ের চেয়ে দামী মানে বই রে ॥
অভিধানে লেখা নাই সব কিছু মানে যে !
অর্থটা সেই পায় খুঁজে নিতে জানে যে ॥
মানেরও রয়েছে মানে, তারও মানে, তারও তো ।
তার মানে, তার মানে, তারপর আরও তো ॥
যে-কথার যত মানে তার তত দাম রে ।
মানে লিখে, টীকা লিখে করে লোকে নাম রে ॥
যার কোনো মানে নাই, খুঁজে বার কর তো ।
বুঝ্‌বো তবেই তোমার বুদ্ধির দর তো ॥

আজব দেশ আমেরিকা

—যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

আজব দেশ এই আমেরিকা—আর সব চাইতে আজব সহর এই নিউইয়র্ক। যতবারই এদেশে আসি, এদেশের ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমার প্রিয় 'শুকতারা'র পাঠক-পাঠিকা বন্ধুদিগকে এই আজব দেশের আজব কথা শোনাব। ম্যাজিক দেখাবার জন্যে সুপ্রসিদ্ধ এন. বি. সি. (N. B. C.) টেলিভিশন কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমি সদলবলে কলিকাতা থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি।

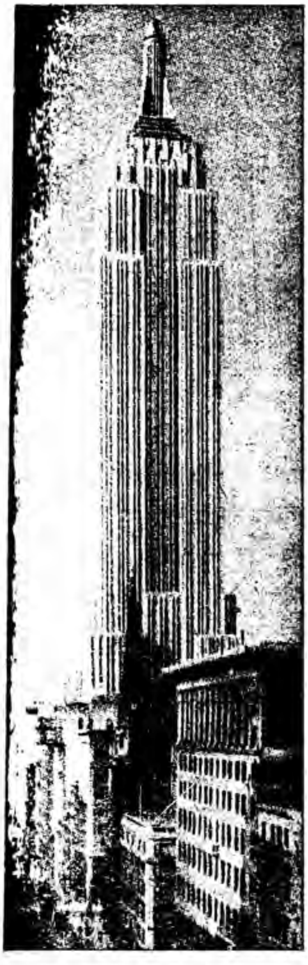

দিনের বেলায় এম্পায়ার ষ্টেট-বিল্ডিং

রাত্রিবেলায় এম্পায়ার ষ্টেট-বিল্ডিং

এখানকার ব্রুকলিন রঙ্গিন টেলিভিশন থেকে আমাদের খেলা সারা আমেরিকাতে প্রচার করা হবে। ব্রুকলিন নিউইয়র্ক সহরেরই একটা অংশ। কলিকাতায় যেমন শ্যাম-বাজার, বালিগঞ্জ, ভবানী-পুর, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া আছে—নিউইয়র্ক সহরটাও ঠিক তেমনি পাঁচটি ভাগে বিভক্তঃ ম্যানহাটান (Manhattan), ব্রনক্স (Bronx), ব্রুকলিন (Brooklyn), কুইনস (Queens) ও রিচমণ্ড (Richmond)। নিউইয়র্ক বলতে এই পাঁচটির সমষ্টি বুঝায়। তবে এদের ম্যানহাটান এলাকা হল যেন কলিকাতার চৌরঙ্গী, কারণ যত বড় বড়

বিরাট অফিস, বাড়ী, গাড়ী, সিনেমার সমারোহ—এই এলাকাতেই সব আছে। নিউইয়র্কের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ এবং আয়তন ৩২০ বর্গমাইল। দেশ বিভাগের পর কলিকাতায় যেমন লোকসংখ্যা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেছে—নিউইয়র্কের ইতিহাসেও ঠিক সেইভাবে লোক বেড়ে চলেছে।

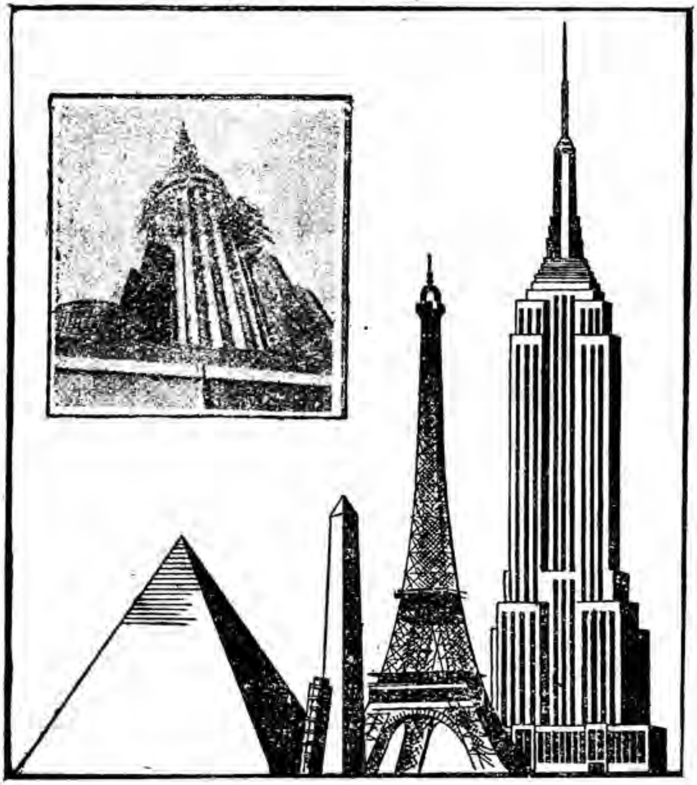

ডান দিকে থেকে বাম দিকে : (১) এম্পায়ার ষ্টেট-বিল্ডিং (১২৫০ ফুট) (২) প্যারিসের এফিল টাউয়ার (৯৮৪ ফুট) (৩) ওয়াশিংটনের মনুমেণ্ট (৫৫৫ ফুট) (৪) মিশরের পিরামিড (৪৮০ ফুট) ও (৫) (উপরে) পিসার হেলানো টাউয়ার (১৭৯ ফুট)

১৬৬৪ সালে নিউইয়র্কে ছিল লোকসংখ্যা ৪৫০০। ১৭৬৪ সালে ছিল ২৪০,০০০ মাত্র। এটা একেবারে নূতন সহর; রোম ভিয়েনার মত এটা পুরাতন বনেদী নয়, একেবারে আনকোরা নূতন—বয়স মাত্র ১৫০ বৎসর। মাত্র দেড়শ বছরের মধ্যে এই সহরটা গড়ে উঠেছে, আর যেন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত কোন যাদুস্পর্শে পৃথিবীর আজব সহরে পরিণত হয়েছে। কলিকাতায় ১০ তলার বেশী বাড়ী কয়টা আছে, হাতে করে গোণা যায়, লণ্ডনেও তাই। নিউইয়র্কে ১০ তলার উপরে বাড়ীর সংখ্যা ৪৩০০, তার মধ্যে সবচাইতে উঁচু বাড়ী এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ১০২ তলা এবং ১,২৫০ ফুট উঁচু। এর চূড়া যেন সর্বদা মেঘেই ঢাকা থাকে। নিউইয়র্ক সহরে মোট স্কুল আছে ১১৫০টির উপরে। এই সহরে মোট টেলিফোন আছে ৩০ লক্ষেরও উপর অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন, ফরাসীর রাজধানী প্যারিস, জার্ম্মানীর বার্লিন, ইতালীর রোম ও বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্—এই পাঁচটি বড় বড় দেশের বড় বড় সহরে যতগুলি টেলিফোন আছে

সব একত্র করলেও তার সমষ্টি নিউইয়র্কের টেলিফোনের সংখ্যার চাইতে অনেক কম।

এ সহরে সিনেমার সংখ্যাও পৃথিবীর অন্যান্য সহরের চাইতে অনেক বেশী, কারণ এই সহরেই আছে ১,১০০টি থিয়েটার আর সিনেমা—আমাদের কলিকাতার সঙ্গে তুলনা করলে হাসিই পায়। এই যে বিরাট জনসমুদ্রের ভীড় তাতে কি অস্বস্তি মনে হয়? মোটেই না। নিউইয়র্ক সহরে এখন যত জায়গা আছে তাতে ২৫০ লক্ষ লোকের অনায়াসে থাকা চলে, এখানে থাকা খাওয়ার অভাব নেই। ভেবে অবাক্ হতে হয় আমাদের কলিকাতায় স্থানাভাবে লোকেরা রাস্তায় ময়দানে পড়ে থাকে আর চারিদিক থেকে তাড়া খায়!

আলোক উদ্ভাসিত রাত্রের নিউইয়র্ক।

ভগবানের এই সুয়োরাণী-দুয়োরাণী ব্যবহার কিজন্য তা' তিনিই জানেন! একদিকে অর্থের প্রাচুর্য্য, খাদ্য বাড়ী গাড়ী অপচয়; অন্যদিকে ক্ষুধাক্লিষ্ট নিরন্ন অন্ন-বস্ত্রহীন শতছিন্ন বিক্ষিপ্ত জনসমুদ্রের মিছিল। কলিকাতায় হাওড়া পুল যেমন বিখ্যাত, এখানে সবচাইতে নাম-করা পুলের নাম ব্রুকলিন পুল (Brooklyn Bridge).

এই পুলটি ৬০১৬ ফুট লম্বা—এর চেয়ে লম্বা আরও অনেক পুল এই নিউইয়র্ক সহরেই আছে। লণ্ডনে যেমন টেমস নদীর তলা দিয়া রেল যায় তেমনি মাটীর নীচ দিয়ে, নদী বা সমুদ্রের তলা দিয়ে এখানে অনেক টানেল (Tunnel) তৈরী হয়েছে। টানেল বলতে আমাদের দেশে রেল-যাওয়া পাহাড়ী টানেলের সঙ্গে গণ্ডগোল করলে চলবে না।

হাডসন নদীর তলা দিয়ে ৯,২৭৭ ফুট লম্বা টানেলটিতে পায়ে চলার রাস্তাই

২০ ফুট চওড়া, আর ১২½ ফুট উঁচু জিনিস নিয়ে ট্রাক যাতায়াত করতে পারে। যাতায়াত করার কথা বলা ভুল। যেটি যাওয়ার রাস্তা সেটি আসার রাস্তা নয়। রাস্তার ফুটপাথেও তাই লোকেরা go to the right চলে—ফুটপাথে ডানদিক দিয়ে হাঁটতে হয়। আবার ভুল বলা হল। নিউইয়র্কে লোকেরা হেঁটে পথ চলে না—সবাই দৌড়ায়। শিয়ালদা ষ্টেশনে ট্রেণ ফেল হবার ভয়ে যেমন যাত্রীরা মাঝে মাঝে দৌড়ায় ঠিক সেইমত। এ দেশের লোকেরা আয়েসী নয়, খুব কাজ করে, প্রচুর বাড়ী-গাড়ীর মালিক হয়েও এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে—আমরা সে তুলনায় আয়েসী।

দিনের বেলায় নিউইয়র্ক সহর।

ভেবে দেখ আমরা ৯টার সময় নিউইয়র্ক বিমানঘাঁটিতে কলিকাতা থেকে পৌঁছালাম। কলিকাতা থেকে নিউইয়র্ক অর্দ্ধেক পৃথিবী মন্থন করে পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছি, তাই ভাবছিলাম একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে সহর দেখে পরদিন কাজ আরম্ভ করবো। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত—১১টার সময় ম্যানহাটান টাওয়ারে আমাদের 'রিহার্স্যাল' দিতে হবে! অর্থাৎ ১১টা থেকে ৫টা অফিস ডিউটি দিতে হবে। ক্লান্ত শরীর, পেটে ক্ষুধা, চক্ষুভরা ঘুম নিয়ে আমরা রিহার্স্যাল দিলাম। ৫টায় ছুটি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম 'ষ্টেট গেষ্ট' হয়ে। মজা এখানে দিনে ঘুম পায়, রাত্রিতে ঘুম আসে না—ওদের দিনই যে আমাদের রাত। অভ্যাস অনুযায়ী কিছুদিন ঐ সময় ভীষণ ঘুম আসে।

এই প্রবন্ধটা এখন রাত্রি ৩টার সময় বসে লিখছি। এখানে বাড়ী ঘর দিনরাত খোলা। যন্ত্রপাতির রাজত্ব খুব বেশী—সবই যথাসম্ভব অটোমেটিক (স্বয়ংক্রিয়)। বারান্তরে সে বিষয়ে লিখে জানাব। আজব সহরে আরও অনেক আজগুবি ব্যাপার আছে, পরে তাও সব জানাব। এর পর রাশিয়ার রাজধানী 'মস্কো'য় যাব—তখন দুই দেশের তুলনা করে লেখবার ইচ্ছা আছে।

ইণ্ডিয়ার লোক নয়, ইণ্ডিয়ান তবু!

—প্রবীরকুমার

লেখাটার নাম প'ড়েই হয়ত ভাবছ—এ একটা ধাঁধা!

না, ধাঁধা মোটেই নয়।

আমাদের ভারতবর্ষের ইংরেজী নাম ইণ্ডিয়া, তা তোমরা জানো। সেই শত শত বৎসর আগে ইউরোপের লোকেরা ডাঙ্গা-পথ বেয়ে যেদিন ভারতের পশ্চিম সীমানায় এসে পৌঁছোলো, সেদিন প্রথমেই তাদের চোখে পড়ল বিশাল সিন্ধুনদ। সিন্ধুনদের দেশ ব'লে এদেশকে তাই তারা নাম দিল সিন্ধ্ বা হিন্দ্। তা' থেকেই ইণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি।

সেই হিসাবে আমরা ইণ্ডিয়ান।

কিন্তু আমরা ছাড়াও আরও ইণ্ডিয়ান আছে। আমেরিকা জানো ত? ভারত থেকে জাহাজ ছেড়ে বরাবর পূবদিকে চালিয়ে যাও যদি, প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছোবে। আর ইউরোপের লোক যদি আমেরিকায় যেতে চায়, তাকে জাহাজ চালাতে হবে পশ্চিম পানে অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে তবে সে আমেরিকার উপকূল দেখতে পাবে।

এখন, এই যে আমেরিকা মহাদেশ, চা'র পাঁচশো বছর আগে এর অস্তিত্বই জানা ছিল না ইউরোপের লোকের। অতলান্তিকের ওপারে কোন দেশ আছে, এটাই তাদের ধারণা ছিল না। কলম্বাস নামে এক দুঃসাহসী নাবিক ছিলেন। তাঁর নাম অবশ্যই শুনেছ তোমরা। তাঁর মাথায় প্রথম ঢুকল এই কথাটি যে মহাসাগরের ওপারে নিশ্চয়ই ডাঙ্গা আছে। কারও নিষেধ তিনি শুনলেন না; দু'খানি জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অকূল সমুদ্রে। স্পেনের রাজা ও রাণী তাঁকে এই জাহাজ দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন প্রচুর অর্থ—অভিযানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে।

কলম্বাস

অনেক কষ্টে, বহু বিপদ অতিক্রম ক'রে অজানা মহাসাগর পাড়ি দিলেন কলম্বাস। পৌঁছোলেন এক নতুন দেশে।

এখন, কলম্বাসের মনে হ'ল—এই যে দেশ তিনি আবিষ্কার করলেন—এই দেশই ইণ্ডিয়া—যার কথা আরব বণিকদের মুখে ইউরোপের লোকেরা অহরহঃই শুনতে পায়। ইণ্ডিয়ায় এর আগে সাহেবেরা যায় নি, তা নয়; কিন্তু তারা সবাই গিয়েছে ডাঙ্গা পথে। এবার কলম্বাস ভাবলেন—ইণ্ডিয়ায় যাওয়ার জলপথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন, আর আরবদের মুখ চেয়ে ব'সে থাকতে হবে না ইউরোপকে; জাহাজ নিয়ে সরাসরি ইণ্ডিয়ায় এসে বাণিজ্য করা যাবে।

নতুন এই দেশকে সবাই জানল ইণ্ডিয়া ব'লে! সেখানকার আদিম অধিবাসীদের নাম হ'ল ইণ্ডিয়ান।

এই যে সাংঘাতিক একটা ভুল—এটা অবশেষে ভাঙ্গল ভাস্কো-ডা-গামা যখন সত্যি সত্যি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে এসে হাজির হলেন।

কলম্বাসের জাহাজ

আসল ইণ্ডিয়া যখন এইভাবে খুঁজে পাওয়া গেল তখন বেধে গেল ভারি গোলমাল। কলম্বাসের আবিষ্কৃত দেশকে ইণ্ডিয়া বলা তখন রীতিমত অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ইউরোপের লোকের; এখন দুটো ইণ্ডিয়ায় সদাই তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে অবশেষে আমেরিগো নামে এক নাবিকের নাম অনুসারে নতুন মহাদেশটির নামকরণ হ'ল আমেরিকা। কিন্তু এখানকার আদিম অধিবাসীরা আগের মত ইণ্ডিয়ানই রয়ে গেল। 'আমেরিকান' নাম কি চালু হয়নি?—হ'য়েছে! তবে সে-নাম করলে আদিম অধিবাসীদের কেউ বোঝে না, বোঝে সেই সব লোককে, যারা ইউরোপ থেকে এসে আমেরিকাকে তাদের মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে।

ভাস্কো-ডা-গামা

কাজেই দেখছ—আসল ইণ্ডিয়ার লোক না হয়েও মার্কিন মুলুকের এক আদিম জাতি বরাবর 'ইণ্ডিয়ান' নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। তবে হ্যাঁ, আমাদের থেকে আলাদা ক'রে বোঝাবার জন্য এই ইণ্ডিয়ানদের নামের আগে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে; সে-বিশেষণটি হ'ল "রেড" বা লাল। ওদের গায়ের রং তামাটে ব'লে ওদের 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলা হয়।

এখন, যদিও বহুদূরের এই জাতি কোন দিক দিয়েই আমাদের স্বজন নয়, তবু নামের দিক দিয়ে এরা আমাদের "মিতা"। বাংলার পাড়াগাঁয়ে একটি রীতি আছে। একই নামের

দু'জন লোক—পরস্পরকে মিতা বা মিত্র ব'লে ডাকে! সেই নজিরেই আমরা ওদের মিতা বলতে পারি।

মিতা যখন, তখন ওদের সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত বই কি!

আমাদের এই মিতারা এককালে বাস করত সারা উত্তর আমেরিকায়। এখন যে অঞ্চলে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ দেখতে পাওয়া যায়, সেই সুবিশাল ভূখণ্ডটিই ছিল এদের বাসভূমি। কিন্তু ইউরোপ থেকে নতুন এসে যারা ঐ সব দেশ গ'ড়ে তুলেছে, সেই আমেরিকানদের তাড়া খেয়ে ইণ্ডিয়ানেরা এখন দুর্গম পাহাড়ে, নিবিড় জঙ্গলে মুখ লুকিয়েছে।

আমেরিগো

গোড়ার দিকে আমেরিকান সাহেবেরা মনে করত—সব ইণ্ডিয়ানই বুঝি এক জাতির ও এক প্রকৃতির লোক। কাজেই দুই চারিজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরেই যে কোন সাহেব গোটা ইণ্ডিয়ান জাতিটার সম্বন্ধেই বড় বড় কেতাব লিখে ফেলত। এটা যে কত বড়ো ভুল, তা' ধরা পড়েছে পরবর্ত্তী কালে।

এখন এ-কথা সুবিদিত যে, ইণ্ডিয়ান জাতির ভিতর নানা উপজাতি রয়েছে। প্রত্যেকটি উপজাতির ভাষা পৃথক, বাসস্থান পৃথক, রীতিনীতি, জীবিকা নির্ব্বাহ করবার প্রণালীও পৃথক। তবু এটা ঠিক যে পার্থক্যের ভিতরেও সাদৃশ্য আছে অনেকখানি। গায়ের রং, মুখের চেহারা সকল উপজাতির ভিতরই প্রায় একরকম। তা ছাড়া, কতকগুলি আচার এদের ভিতর সর্ব্বজনীন। সকলের আগে উল্লেখ করা যেতে পারে এদের অতিথি-সেবার কথা। যে কোন ইণ্ডিয়ানের গৃহে অতিথির সমাদরের অন্ত নেই। সে যদি শত্রুও হয়, তবু যতক্ষণ সে অতিথি, ততক্ষণ সে নিরাপদ।

অতিথি গৃহে এসে দ্বারের দক্ষিণ দিকে বসবে—এইটেই হ'ল রীতি। গৃহকর্ত্তা যদি তাকে বিশেষ খাতির করতে চান, তবে তাকে বলবেন—"তুমি বাম দিকে এসে বসো।" বিশেষ-খাতির অবশ্য সবাইয়ের জন্যে নয়, কিন্তু অতিথি যেই হ'ক, তাকে খাদ্য-পানীয় দিতেই হবে। আর দিতে হবে, সে আসা মাত্রই। গৃহিণীর এটা পবিত্র কর্ত্তব্য। যখন যে-অবস্থায় যে-রকম লোকই অতিথি হয়ে আসুক, আগে তাকে খেতে দাও, পরে অন্য কথা। কোন লোক হয়ত জরুরী খবর কিছু নিয়ে এসেছে, কিন্তু কী সে খবর—তা কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, যতক্ষণ লোকটি খেয়ে দেয়ে সুস্থ না হচ্ছে।

ইণ্ডিয়ানদের আর একটি রীতি হচ্ছে—কোন লোকই নিজের স্বার্থ নিয়ে মশগুল হ'য়ে থাকে না। স্বার্থ বলতে কিছু নেই-ই। যে যা করছে—সমাজের জন্যে। একটা গ্রামে যত লোকই বাস করুক, সবাই খাটে সবাইয়ের জন্যে। একজন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আনলে, তা' হবে সমাজের সম্পত্তি। একজন বিপদে পড়লে—সেটা হবে সমাজের বিপদ। উৎসবে, মৃগয়ায়, পূজা-আর্চ্চা, ধর্ম্মকাজে বা যুদ্ধে সবাই জোট বেঁধে কাজ করে। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম ঘটায়, সাজা পায় সে। গ্রামে শান্তিরক্ষক আছে একদল। তাদের কাজ হ'ল এই রকম ক্ষেত্রে সাজা দেওয়া। সব কাজই নিয়ম-মাফিক হওয়া চাই। নিয়ম বা আইন গড়বার জন্যে সমিতি আছে। গ্রামের প্রধান লোকেরা এই সমিতির সদস্য। সদা

একটা ঘর থাকে প্রতি গ্রামে ; সমিতির ঘর এটি। এইখানে ব'সে আইন প্রণয়ন করে সদস্যেরা। এরাই প্রকৃতপক্ষে উপজাতির শাসক। সর্দ্দার একজন থাকে উপজাতির। বাপ ম'রে গেলে ছেলে সর্দ্দার হয়। কিন্তু অন্য পাঁচজনের চাইতে সর্দ্দার কোনদিক দিয়েই বেশী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

কোন ইণ্ডিয়ান কখনও দম্ভ করে না। বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিলে যে-কোন ইণ্ডিয়ান একটা উপাধি-পায়, সেই উপাধিই তার পর থেকে তার নাম হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অনেক শত্রুকে যুদ্ধে যে পরাস্ত করেছে, তার নাম হ'ল শত্রুদমন। কিন্তু অপরিচিত কেউ এসে তাকে যদি নাম জিজ্ঞাসা করে, সে নীরব থাকবে। কারণ 'শত্রুদমন' ব'লে নিজের পরিচয় দিতে গেলেই ত' বীরত্বের দম্ভ করা হয়। এ-রকম অবস্থায় পাশের অন্য কোন লোক হয়ত ব'লে দিতে পারে ওর নাম—নিজে সে মুখ খুলবে না।

এদের নিজেদের কুটিরশিল্প আছে নানা রকম। গাছের বাকল দিয়ে দড়ি তৈরী করে, শণ দিয়েও করে। মাটির বাসন এবং ধূমপানের নল—এসব এরা গড়তে পারে। বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তাঁবু তৈরী হয়, দেহের আবরণও ও-থেকে তৈরী হ'তে পারে। শিকারের পশুর ছালও এই চুই কাজে লাগানো হয়। চামড়া মোটামুটি ট্যান করতে এরা জানে। ভুট্টা, বীন, স্কোয়াশ ও তামাকের চাষ এদের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়। বুনো ধান এদের প্রধান খাদ্য। জলা জায়গায় আপনা হ'তে ধান জন্মায়। নৌকায় চড়ে মেয়েরা গিয়ে ধানের শীষগুলি একত্র ক'রে গোছা বেঁধে রেখে আসে। তারপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যায় পাখী তাড়াতে, তারাও যায় নৌকা চড়ে। পাখীতে ধান খেয়ে যেতে না পারে—তাই দেখে এরা। ধান পাকলে তা কিন্তু কেটে আনে না ওরা। নৌকো নিয়ে যায় ধানক্ষেতে, গোছা-বাঁধা শীষগুলি টেনে নৌকোর উপর আনে, সেইখানে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ধানগুলি গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয় ; ছাড়ানো ধান এসে একেবারে নৌকোর ভিতর পড়ে।

কিন্তু এসব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ত' পাওয়া যায় না। সেজন্য ওরা খাদ্যরূপে বেশী ব্যবহার করে মাংস। মহিষের মাংসই পাওয়া যায় বেশী। বুনো মহিষ অবশ্য। মহিষ-শিকারের উপর সমাজের জীবনমরণ নির্ভর। কাজেই কড়া আইন তৈরী হয়েছে ও-সম্বন্ধে। একা কেউ মহিষ শিকারে যেতে পারে না, এমন কি দৈবাৎ কোন একক শিকারী একটা মহিষের দল দেখতে পায় যদি, তাহ'লে তাদের কোনরকমে উদ্‌ব্যস্ত করার অধিকার তার নেই। তার কর্ত্তব্য হচ্ছে গ্রামে এসে সর্দ্দারকে খবর দেওয়া। খবর পেলে সর্দ্দার গ্রামের সকল শিকারীকে একত্র ডাকবে, সবাই এক সাথে শিকারে বেরুবে।

অনেক সময়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত মহিষের দলের দেখা পাওয়া যায় না। তখন গোটা গ্রামটা সেজে বেরোয় রণসাজে। নারীরাও সঙ্গে যায় শিশুদের নিয়ে। গ্রামটা পরিত্যক্ত পড়ে থাকে। দামী জিনিস সব মাটির তলায় পুঁতে রেখে যায়, যাতে জনহীন গ্রামে অন্য উপজাতির লোক এসে লুঠপাট ক'রে নিয়ে যেতে না পারে।

মহিষের সন্ধানে শিকারের দলকে কখনো কখনো দু'শো, তিন শো মাইলও চলে যেতে হয়। মহিষ-শিকারের অনেক কৌশল জানা আছে ওদের। শীতকালে শিকার খুব সহজ, কারণ মহিষেরা ঝুরো বরফের ভিতর ছুটতে পারে না; খুব কাছে গিয়েই তখন তাদের আক্রমণ করা যায়। তীর-ধনুক বা বল্লম—এই দিয়েই আঘাত করা হয় শিকারকে। পাহাড়ের ভিতর হ'লে আর এক সহজ উপায়

আছে। কোন খাড়া পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হয় দলটাকে। পাহাড়ের কিনারে এসে যখন দাঁড়ায় জন্তগুলো, তখন খুব হৈ-হল্লা করতে থাকে শিকারীরা, ভয় পেয়ে ওরা লাফিয়ে পড়ে পাহাড় থেকে, হাড়গোড় ভেঙ্গে মারা পড়ে।

মহিষের মাংস শুকিয়ে গুঁড়ো করে ওরা। তারপর শুক্‌নো বনফলের গুঁড়ো মেশায় তার সঙ্গে। এই গুঁড়োর নাম হ'ল পেমিকান। ইণ্ডিয়ানদের প্রিয় খাদ্য। অনেকদিন অবিকৃত থাকে, এজন্যও এর আদর বেশী।

ইণ্ডিয়ানদের ভিতর কয়েকটি উপজাতি আবার যাযাবর। এরা ঘোড়ায় চড়ে এবং মাটির ঘরে বাস করে।

কতক ইণ্ডিয়ান শত্রুভয়ে বনে বাস করতে বাধ্য হয়েছে, এ কথা বলেছি। তারা বন্য পশু বধ ক'রে খায় এবং তাদের চামড়া ট্যান ক'রে পোষাক তৈরী করে। তারা আবার বুনো পশু পোষ মানাতেও ওস্তাদ, নেকড়ে বাঘকে পর্য্যন্ত তারা পোষে এবং তাদের দিয়ে বোঝা বহন করায়।

রেড ইণ্ডিয়ান সর্দ্দার

তারা ফলের রস দিয়ে সিরাপ তৈরী করে। কাঠের বা বাকলের পাত্রে ফলের রস ঢেলে তার ভিতর গরম পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে, যতক্ষণ না রসটা ফুটতে সুরু করে।

ঠিক এই রকম ভাবে চিমুক ইণ্ডিয়ানেরা বার করে মাছের তেল। মোম মাছ ব'লে একরকম মাছ আছে, আকারে ছোট কিন্তু খুব বেশী তৈলাক্ত। নৌকোর খোলে প্রচুর জল ঢেলে সেই জলে মাছ অগুণ্‌তি ছেড়ে দেয়। তারপর জলে নিক্ষেপ করে একটার পর একটা গরম পাথর। জল যখন ফুটতে সুরু করে, তখন তার উপর ভেসে ওঠে মাছের তেল। চামচ দিয়ে সেই তেল কেটে নিয়ে তারা অন্য পাত্রে রাখে।

চিনুকদের প্রিয় জিনিস এই তেল, দুই বেলা খাওয়ার সময় এক বাটি করে খাওয়া চাই। শুক্‌নো যে-কোন খাদ্য এই তেলে ডুবিয়ে তবে ওরা খায়।

চিনুকদের প্রধান খাদ্যই মাছ, শুকিয়ে মজুদ ক'রে রাখে; অন্য খাবার যখন পাওয়া যায় না, তখন শুকনো মাছই বাঁচিয়ে রাখে তাদের। এরা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি এবং চমৎকার সব কম্বল বুনতে পারে।

গ্রামবাসী ইণ্ডিয়ান আছে এক শ্রেণীর, তাদের নাম পুয়েব্‌লো। তাদের বাড়ীগুলি রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরী। সমুখের এক সারি বাড়ী হয় একতলা, ঠিক তার পিছনে থাকে এক সারি দোতলা, তারও পিছনে তিনতলা—এই রকম! ছাদ সব সমতল। একতলার ছাদ থেকে মই বেয়ে দোতলার ছাদে এবং দোতলার ছাদ থেকে মই বেয়ে তেতলার ছাদে—এইভাবে এই পুয়েব্‌লোরা ওঠানামা করে। কারণ এসব বাড়ীতে ঢুকবার দরজা নেই। মই দিয়ে ছাদে ওঠে, ছাদেতে দরজা। এরা চাষী লোক এবং শান্তিপ্রিয়। সেইজন্য এদের উপর শত্রুর অত্যাচার ছিল বেশী। সেই ভয়েই এঁরা এভাবে বাড়ী তৈরী করত।

এরা রুটি তৈরী করতে জানে। জাঁতার মত একপ্রকার যন্ত্রে গম বা অন্য শস্য গুঁড়ো ক'রে তাদের হয় রুটি। নানা রকম পশু এরা পালন করে। কাপড় বুনতে পারে এবং ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে নাচগানও করে। বৃষ্টির অভাব হলে সাপ-নৃত্য এদের সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস। জ্যান্ত সাপ ধ'রে এনে তাই গায়ে জড়িয়ে এরা নাচে। এসব সাপ নির্ব্বিষ নয়, র‍্যাট্‌ল সাপ পর্য্যন্ত এরা এইজন্য ধরে আনে, যে র‍্যাট্‌ল সাপের কামড় মানেই মৃত্যু।

মেকি ইণ্ডিয়ানেরা বাস করে পাথরের ঘরে টিলার মাথায়। তারাও কাপড় বুনতে দক্ষ। পাহাড়ের ভিতর গুহা কেটে তার ভিতরও এরা বাস করে।

নদীর ধারে ধারে অনেক ইণ্ডিয়ান বাস করে, নৌকা তাদের নিত্য ব্যবহারের জিনিস। বড় বড় দেবদারুজাতীয় গাছ কাটে তারা। তারা গাছের গুঁড়িটা কুরে কুরে ঠিক আমাদের ডোঙ্গা-তৈরীর কায়দায় নৌকা তৈরী করে। এসব নৌকা পঞ্চাশ ষাট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, আমাদের দেশের ছিপ নৌকার মত।

অনেক ইণ্ডিয়ান বেশীর ভাগ সময় নৌকাতেই বাস করে। তাদের দেখলেই চেনা যায়, পা দু'খানা ছোট ও কোঁকড়ানো।

সাধারণ ইণ্ডিয়ানেরা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় হলেও যুদ্ধ করতে নারাজ নয়। কোন কোন উপজাতি আবার স্বভাবতঃই যুদ্ধবিলাসী। বিভিন্ন উপজাতির ভিতর শত্রুতা থাকাই যেন ওদের রীতি। আর সে-শত্রুতার ফলে আগের দিনে রক্তবন্যা বয়ে যেত প্রায়ই। মাথা-শিকারীরা শত্রুর মাথার চুলশুদ্ধ চামড়া খুলে এনে কটিবন্ধে ঝুলিয়ে রাখত। এরাই ছিল বাহাদুর সেকালে। এখন অবশ্য সেদিন আর নেই। সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সংস্পর্শে এসে এরা অনেকটা শান্ত হয়েছে।

মৃতদেহ এরা গাছের উপর বা মাচার উপর রেখে দিত আগের দিনে। সিওক্স জাতির রীতি ছিল—কোন যোদ্ধার মৃত্যু হ'লে তার ঘোড়াটাকেও হত্যা ক'রে প্রভুর সঙ্গে কবর দেওয়া। শুধু ঘোড়া নয়, তার অস্ত্রশস্ত্রও দিয়ে দেওয়া হত কবরের ভিতর। এদিক দিয়ে আমাদের দেশের কোন কোন রাজপুত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের মিল আছে।

সেকালের নরবলি

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

জয়চণ্ডীর পাহাড়—জয়চণ্ডী মন্দির

[কলিকাতা হইতে যাঁহারা আদ্রা হইয়া পুরুলিয়া যান, কিংবা আসানসোল হইতে ঐদিকে যান—তাঁহারা দেখিতে পাইবেন একটি ত্রিচূড় পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর দেখা যায় একটি মন্দির। সেই মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি। জয়চণ্ডী নামে আখ্যাতা। মানভূম অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এস্থানে হইত নরবলি। গুরুতর অপরাধীর হইত প্রাণদণ্ড এইখানে, এবং দেবীর নিকট হইত—পাঁঠা, মহিষ, এমন কি শূকর-বলি। আমি আদ্রার কিশোর সাহিত্য সম্মেলনে গিয়া এই জয়চণ্ডীর পাহাড় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই জয়চণ্ডী ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পঞ্চকোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি গুহা আছে। সেই গুহার মধ্যে অনেক সময় দস্যু-ডাকাতেরা আত্মগোপন করিত। হিংস্র জন্তু ইত্যাদির ভয়ে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত বিজন পাহাড়ের দিকে কেহ বড় একটা যাইত না। তখন পাহাড়ের নীচে বর্ত্তমানের ন্যায় কোন পল্লী গড়িয়া উঠে নাই। দূরে দূরে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীর ছিল বাস। আমরা এখানে যে সময়ের কাহিনী বলিতেছি তখন পঞ্চকোট রাজাদের ছিল অসীম প্রতাপ।]

এক

পঞ্চকোট রাজধানীতে চলিয়াছে মহা গোলযোগ। রাজার দরবারে নিত্য অভিযোগ আসে চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যার। রাজধানীতে ত হয়ই, পল্লীগ্রামেও নিত্য উৎপীড়ন চলে। ডাকাতেরা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, সে খবর কেহ জানে না। অথচ রাজার কাছে প্রতিদিন আসিয়া বলে—আমাদের গাঁ লুঠ হইয়াছে, গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছে, গরু-বাছুর চুরি করিয়া লইতেছে। প্রজারা নিত্য অভিযোগ করে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় না। অবশেষে একদিন হইল রাজবাড়ীর পাশেই ডাকাতি! রাজবাড়ী হইতে সৈন্য-সামন্ত প্রহরীরা গেল, কিন্তু দস্যুদল ধরা পড়িল না। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া অন্তর্হিত হইল। তবে লোকে বলিত এই দস্যুদলে ঠগী, লেঠেল, ঠ্যাঙ্গাড়ে এবং নানা দেশের লোক আছে। দলের নেতা একজন পাঞ্জাবী। তার নাম কেহ ঠিক জানে না, আমরা তাই দিলাম কুন্দন সিং। দুর্দ্দান্ত এবং দুঃসাহসিক দস্যু সে।

পঞ্চকোটের সে সময়ে কে রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বলিতে পারিব না। তবে যিনি ছিলেন তিনি সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন। রাজ্যের নিকটবর্ত্তী স্থানের দুই চারিটা সাময়িক ছোট বড় বিদ্রোহ-বিপ্লব তিনি নিজে দমন করিয়াছেন অদম্য সাহস ও বীরত্বের সহিত। রাজবাড়ীর পাশে হইল ডাকাতি! এ অপমান তাঁহার প্রাণে ভীষণভাবে বাজিল। স্থির করিলেন ডাকাত দমন করিতেই হইবে।

সে সময়ে রাজা যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইত সেই সব অপরাধীদের এই পাহাড়ের উপরের একটি উচ্চ স্তম্ভ হইতে ফেলিয়া দিতেন পাহাড়ের ভিতরের এক গভীর গহ্বরে—কিংবা দেবীর কাছে দিতেন বলি। এই জয়চণ্ডী পাহাড়ের উপর এখনও সেই ইষ্টকনির্ম্মিত স্তম্ভটি আছে। তাহার উপর হইতে দেখা যায় চারিদিকের দিগন্তবিসারী সমতল ক্ষেত্র—দূর দিগন্তে যেখানে বিস্তৃত প্রান্তর মিশিয়া গিয়াছে চক্রবালরেখার সহিত। কোথাও ঘন বন, কোথাও শ্যামল প্রান্তর, কোথাও

বিশীর্ণা নদী—প্রান্তরবাহিনী, চলিয়াছে অলক্ষ্যে বুকে লইয়া আপন সলিল-সম্ভার। মাঠে মাঠে কৃষাণরা ক্ষেতে কাজ করে, গরু-মহিষেরা চরিয়া বেড়ায়। রাখাল বালকেরা—সাঁওতাল বালকেরা বাঁশী বাজায়। আর দূরে দূরে দেখা যায় শ্যামল ভূধরশ্রেণী—পঞ্চকোট পাহাড়শ্রেণী। শোভা সৌন্দর্য্য অনুপম। এখনকার এইরূপ শোভা-প্রশস্ত রাজপথ তখন ছিল না। ঘন বনের আড়ালে ছিল মাটির কুটির-শ্রেণী শোভিত পল্লীগ্রাম। তখন দূরের পঞ্চকোট পাহাড় করিত সকলকে আকর্ষণ তাহার ভীম ভয়ঙ্কর রূপের দ্বারা। এখনও তাহার অনেক পরিচয় মিলে। এখনও সে আগেরই মত দাঁড়াইয়া আছে। যে স্তম্ভটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে, অনেকে বলেন উহা ছিল পর্য্যবেক্ষণ স্তম্ভ বা 'ওয়াচ্ টাউয়ার'—দূর হইতে শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণের জন্য।

এদিকে রাজা পাঠাইলেন অনুচর লোকজন, সন্ধান করিতে, কোন্ পথে কোথায় পলাইয়া গেল দস্যুদল। অবশেষে রাজ্যের একজন সতর্ক চতুর ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে নানা দেশ-বিদেশ, নানা লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন দেখিতে পাইলেন, প্রায় পঞ্চাশজন ডাকাত—জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে এক অজানা বনপথে। সন্ন্যাসী দূর হইতে তাহা দেখিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি গাছে চড়িয়া আত্মগোপন করিয়া লক্ষ্য করিলেন, আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যুর মত জয়চণ্ডীর পাহাড়ের বনে জঙ্গলে তাহারা অদৃশ্য হইল। আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন গুপ্তচর। পাহাড়ে কোথায় গেল! এ সংবাদ দিল সে রাজার বাড়ী। এ সংবাদের পরও রাজা শুনিলেন রাজবাড়ীর তোষাখানা হইতেও বহু মূল্যবান বাসন-কোশন অপহৃত হইয়াছে! রাজার ক্রোধ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি জয়চণ্ডীর পাহাড়ের দিকে একদিন গভীর নিশীথে চালাইলেন অভিযান।

দুই

সৈন্যদল, লেঠেল, অশ্বারোহী ও পদাতিক সকলে পাহাড়ের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। রাজা হুকুম দিলেন সৈন্যাধ্যক্ষকে যেমন করিয়া পার জীবন্ত ধরিয়া আনিতে হইবে—দস্যু কুন্দন সিংকে। পরদিন সকালবেলা, দস্যুদল দেখিল তাহারা চারদিক দিয়া আক্রান্ত। যেদিকে যে পথে যায়, সেদিকেই শত্রুরা ব্যূহ রচনা করিয়াছে। পালাইবার পথ নাই। সর্দ্দার কুন্দন বলিল, ভাই সব জান দিবে—তবু ধরা দিবে না। মরিয়া হইয়া উঠিল ডাকাতদল। আরম্ভ হইল লড়াই। রাজার বন্দুক হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম শব্দে বন্দুকও গর্জ্জিতে লাগিল। তীরন্দাজেরা তীর ছুঁড়িতে লাগিল।

দস্যুরা সংখ্যায় ছিল মাত্র পঞ্চাশ জন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে, তাহারা কেহ ধরা পড়িল, কেহ পালাইয়া বাঁচিল। কুন্দন সিং পাহাড়ের উপর একটি গুহায় লুণ্ঠিত ধনরত্নের পাশে তাহার একান্ত বিশ্বস্ত দুই চারজন দস্যুর সহিত নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিল। সে ভাবিতে পারে নাই যে ধরা পড়িবে। কুন্দন যে গুহার ভিতরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে গুহা আমরা দেখিয়াছি। তাহার প্রবেশ-পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও নীচু। হামাগুড়ি দিয়া ভিন্ন প্রবেশ করা যায় না—কিন্তু ভিতরে বেশ প্রশস্ত এবং পাশাপাশি পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি গুহা আছে ছোট বড়, তাহার ভিতরে নিরাপদে বাস করিত দস্যু সর্দ্দার তাহার দলবল সহ।—শিলার পাশে পাশে কণ্টকগুল্ম ও নল গাছের আড়ালে ছিল পথ, সে পথ দিয়া তাহারা আসা-যাওয়া করিত। পাহাড়ের চারিদিক বেড়িয়া ছিল গভীর বন।

কুন্দন কোনরূপেই পলায়নের পথ পাইল না। রাজার সেনারা সন্ধান পাইল এই গুপ্ত গুহার কথা—ধৃত এক দস্যুর নিকট হইতে। সে-ই শিলার পর শিলা ডিঙ্গাইয়া তাহাদিগকে কুন্দনের গুহার কাছে লইয়া আসিল। তারপর সে নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কুন্দন সহসা আক্রান্ত হইয়াও শত্রুর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। সে তাহার অনুচরদের সহ ধৃত হইয়া রাজকারাগারে হইল বন্দী। তাহার চারদিকে রহিল সতর্ক প্রহরী।

তারপর একদিন হইল বিচার। বিচারে কুন্দন সর্দ্দার ও তাহার অনুচরদের প্রতি রাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

পাহাড়ের গায়ে গুহার দ্বারপথ

তিন

এক অমাবস্যা তিথিতে রাজপুরোহিত আসিলেন এই পর্ব্বতশৃঙ্গে জয়চণ্ডীর পূজা করিতে। বিপুল রবে বাজিয়া উঠিল শত শত ঢাক,ঢোল, কাঁসর, বাঁশী। বাজিল বলির বাজনা। অবশেষে তান্ত্রিক পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া জলদ্বারা শক্তিকে অভিষেক করিলেন—'পবিত্রী কুরু' বলিয়া পরে 'মমসিদ্ধিং কুরু' বলিয়া অর্ঘ্যদান করিলেন—তারপর সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দ্দারকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলি দেওয়া হইল। রক্তের ফিন্‌কি ছুটিল চারিদিকে! এইভাবে অন্যান্য বন্দী দস্যুও সেদিন এই পাষাণী জয়চণ্ডীর মন্দির-প্রাঙ্গণে মৃত্যুকে বরণ করিল।

জয়চণ্ডীর মন্দির—সম্মুখে হাড়িকাঠ

আমি পর্ব্বত-পাদমূলে পল্লীর একজন বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের নিকট বসিয়া শুনিতেছিলাম এই কাহিনী! তিনি বলিলেন—রাজা এই দুর্দ্দান্ত দস্যুকে ধৃত ও নিহত করিয়া প্রজাগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টিতে এই পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকেন, 'দেবস্থান' বলিয়া পূজা করেন। কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার কথাও তিনি বলিলেন। মাঝে মাঝে জয়চণ্ডীর পাহাড়ের কাছে আসিয়া রেলগাড়ী থামিয়া যাইত। এখন জয়চণ্ডী ষ্টেশন হইয়াছে। স্থানটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদপ্রান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলাম—অপলকে চাহিয়া রহিলাম। তোমরা এই পথে গেলে পর্ব্বত-চূড়ায় জয়চণ্ডী দেবীর মন্দির দেখিতে পাইবে।

দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার

—শিবরাম চক্রবর্ত্তী

ডিটেক্‌টিভ গল্পের জোঁক—পড়াশুনার ফাঁকে যেটুকু ফুরসৎ পায় গোয়েন্দা-কাহিনীর বই পড়েই সে কাটায়। তাছাড়া অন্য কোনো ঝোঁক তার নেই—না ক্যারমের, না ঘুড়ি ওড়ানোর, না আর কোনো খেলাধূলার।

তার জীবনের আকাঙ্ক্ষাই হোলো যে বড়ো হয়ে খুব বড়ো এক ডিটেক্‌টিভ হবে এবং মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে যত সব ভয়ানক ভয়ানক চোর, ডাকাত, খুনে—এদের গ্রেপ্তার করবে। তার ধারণা, ইতিমধ্যেই তার মাথা এমন পেকেছে যে এখনি সে বড় বড় চুরি, ডাকাতি, খুনের কিনারা করতে পারে—যদি এসবের কিনারে গিয়ে পড়ে। আর এই সব কাণ্ডর রহস্যভেদের ভার তার উপর দেওয়া হয়। কিন্তু সে যে এ সব পারে সে সম্বন্ধে আর কারোই ধারণা হয় না, তার কারণ বোধহয় তার অল্প বয়স। নাঃ, বড় না হলে কিছুই হচ্ছে না, ক্ষুণ্ণমনে এই কথা আলেক্‌জেণ্ডার প্রায়ই ভাবে।

কিছুদিন থেকে তাদের পাড়ায় চুরি লেগেই আছে, ছোটখাট চুরি নয়, রীতিমতন সিঁধ কেটে চুরি। ফি হপ্তায় একটা না একটা বাড়ীতে হচ্ছেই—এত হুদ্দার থানার দারোগা পুলিস তো হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল; একটারও কিনারা করতে পারল না। এই সব চুরির রহস্যভেদ করতে পারত একমাত্র আলেক্‌জেণ্ডার—কিন্তু তাকে এর তদ্বির করতে কেউ ডাকেনি। দুঃখের কথা বলব কি, তাদেরি হোস্টেলের চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা যখন চুরি গেল তখন নিজেই সে অযাচিতভাবে অগ্রসর হয়ে তার কিনারা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করা হয়নি। তাদের হোস্টেল

এবং তাদেরই হোস্টেলের কলের স্টপারটা, সুতরাং এর একটা বিহিত করার তার সম্পূর্ণ অধিকার; তবু এই প্রস্তাব সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে করতেই তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন: "যাক্‌গে, ভারি তো দাম! বারো আনা মোটে।" তথাপি আলেক্‌জেণ্ডার তার প্রস্তাবের পুনরুক্তি করায় তিনি চটে গিয়ে বলেছেন—"তোমাকে আর গোয়েন্দাগিরি ফলাতে হবে না। যাও, নিজের পড়া করো গে।" সেদিন আলেক্‌জেণ্ডার ভারি মর্মাহত হয়েছিল, তার মনে হয়েছিল যে এই স্টপার-চুরির ব্যাপারে হয়ত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কোনো যোগসাজস আছে, পাছে সেই রহস্যটা ফাঁস হয়ে যায় সেই ভয়েই তিনি—হুঁ, ঠিক তাই।

তার আসল নাম কিন্তু আলেক্‌জেণ্ডার নয়, এই নাম তার অল্পদিনের উপার্জিত, এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ক্লাসে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—জেণ্ডার কয় প্রকার? সে উত্তর দিল—তিন প্রকার—ম্যাস্‌কুলিন জেণ্ডার, ফেমিনিন্ জেণ্ডার, আর—আর—আরো যেন কী একটা আছে কিন্তু সেটা আর কিছুতেই তার মনে আসছিল না, পাশের ছেলেটি তখন ফিস ফিস করে তাকে কী বলল। তার প্ররোচনা আর মাস্টারের তাড়না, এই দুয়ের তাড়ায় সে বলে ফেলল—"আর হচ্ছে আলেক্‌জেণ্ডার।"

বলে ফেলেই সে বুঝতে পারলো যে ভুল হয়েছে, কেননা এই তৃতীয় জেণ্ডারটি ত্রিবিধ জেণ্ডারের একটি নয়। এবং এটি গ্রামারের নয়, ইতিহাসের। কিন্তু তখন আর ফিরিয়ে নেবার কোনো উপায় ছিল না। মাস্টারমশাইও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন—"উদাহরণ দাও।"

ম্যাস্‌কুলিন ও ফেমিনিনের উদাহরণ সে দিল, কিন্তু তাই দিয়েই কি নিষ্কৃতি ছিল? মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"আর আলেক্‌জেণ্ডার?" তার উদাহরণ সে কী দেবে? তার উদাহরণ যে মোটে একটিই ছিল এবং সেটিও বহুদিন আগেই বিগত হয়েছে, ইতিহাসপাঠে একথা জানা যায়। সেই একমাত্র ও অবর্তমান উদাহরণে ইতিহাসের মাস্টার পুলকিত হতে পারেন, কিন্তু তাতে কি গ্রামারের টিচারকে খুশি করা যাবে? সে আশা তার খুব সামান্যই ছিল, তাই সে অগত্যা মুখখানাকে এমন একখানা করল যে তার উদাহরণ যেন তার মনে এসেছে কিন্তু মুখে আসছে না।

মাস্টারমশাই বললেন—"ভেবে পাচ্ছ না? তার উদাহরণ যে সামনেই রয়েছে।"

সামনেই রয়েছে? অথচ সে ভেবে পাচ্ছে না। আলেক্‌জেণ্ডার সচকিত হয়ে সামনের সমস্তটা একবার ভালো করে তাকিয়ে নিল।

মাস্টারমশাই বললেন—"তার উদাহরণ তুমি নিজে। তুমিই আলেক্‌জেণ্ডার!" প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে সেদিন থেকে এই নামটাই তার রটে গেল। সকলেই তাকে

এই নামে ডাকতে শুরু করল, ফলে, তার যে আর একটা নাম আছে সে সম্বন্ধে তার নিজেরও অনেক সময় সন্দেহ হতে লাগলো।

এই হোলো তার নতুন নামকরণের ইতিহাস। এই ইতিহাস তোমাদের—আজকের ছেলেমেয়েদের জানবার কথা নয়। অনেকদিন আগে এই কাহিনী একবার তোমাদের বাবাকাকাদের কাছে আমি বলেছিলাম—তখন তাঁরাই ছিলেন তোমাদের মত ছোট ছোট, আর তোমরা এই পৃথিবীতে আসোইনি। সেই কথা আজ আবার নতুন করে তোমাদের শোনাচ্ছি।

সেদিন সকালে উঠেই আলেক্‌জেণ্ডার শুনল যে তাদের পাড়ায় আবার চুরি হয়েছে। এবার আর বেশি দূরে নয়, তাদের হোস্টেলের রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেইখানে শ্রীকুন্দন সিংয়ের বাড়ীতে। ছোট-খাট-চুরি নয়, একেবারে সিঁধ কেটে চুরি! বেচারা কুন্দন সিংয়ের যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চোরে। কুন্দনসিং ভোজপুরি মানুষ, এক লোটা ভাঙ আর সেরখানেক পুরি ভোজন করে সারা রাত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে এই কাণ্ড! আলেক্‌জেণ্ডার ভাবল, চুরিটার তদারক করা তার কর্তব্য। নাঃ চোরদের অত্যাচার একেবারে চরমে উঠেছে। কুন্দন সিং তার আলাপী মানুষ, ভারি ভালো লোক, ভাঙা বাংলায় আর আধা হিন্দিতে অনেক দিন পরে উভয়ের মধ্যে আলাপ জমেছে আর সেই কুন্দনের কিনা এই সর্বনাশ। দারোগা, পুলিস তাদের হোস্টেলের রাস্তা দিয়ে এল আর গেল—কিন্তু তারা যে এই চুরির কিনারা অন্য চুরিগুলোর মত করবে সে বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ ছিল না।

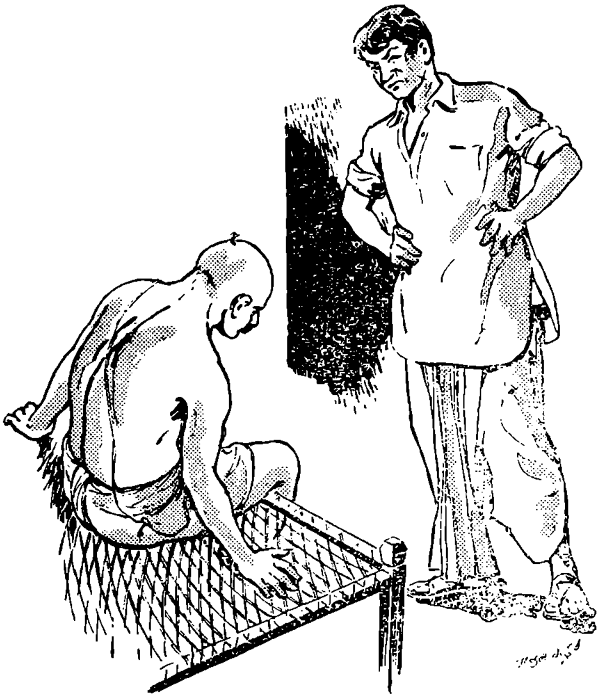
আলেক্‌জেণ্ডার কুন্দন সিং-এর বাড়ী গেল।

কুন্দন সিং-এর বাড়ী গিয়ে আলেক্‌জেণ্ডার দেখল বেচারা মাথায় হাত দিয়ে

বসে আছে। পাকা ডিটেক্‌টিভরা যেভাবে খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু ভাল করে আগে দেখে নেয়, তার সবই বই পড়ে আলেক্‌জেণ্ডারের জানা ছিল। কুন্দনের সঙ্গে কোন কথা না কয়ে প্রথমেই সে তার ঘরের ভিতর, বাহির, চারিধারে খুঁটিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করলো। কিন্তু কোথাও কোনো হাতের ছাপ, কি আঙ্গুলের টিপ কিংবা পায়ের দাগ আবিষ্কার করতে পারল না।

তারপর সে ভোজপুরি বন্ধুর দিকে মনোযোগ দিল—"কুন্দন সিং শোনো, তুমি কিছু ভেব না। আমি চোরদের ধরে তোমার সমস্ত জিনিস বের করে দোব, তুমি দেখে নিও। এখন তুমি বল দেখি, কাল রাত্রে ঠিক ঠিক কী হয়েছিল? যা যা জান সমস্ত বল, কিছুই লুকিয়ো না। সবই আমার কাজে লাগবে।"

কুন্দন তার কথায় কতটা আশ্বস্ত হল সেই জানে, তবে যা যা সে বলল তার মর্ম এই যে, ভোর রাতের দিকে সে তার ঘরের ভিতরে বিল্লির আওয়াজ শুনতে পায়, বোলছিল যে ম্যাও ম্যাও—তাতে তার নিদ্ টুটে যায়। একবার সে ভাবতেও ছিল যে কেয়ারি ত বন্দ্ আছে বিল্লি আসছে কুন্ পাকে? কিন্তু কাল রাত্রে নেশাটা বড়ি জোর হয়ে গিয়েসিল বলে তার উঠার ফুরসৎ মিললো না।

আলেক্‌জেণ্ডার ভাবিত হয়ে বলল—"হুঁ। বিল্লি বোলছে ম্যাও ম্যাও! তারপর?"

"তারপর ফজিরে উঠে দেখি এহি ব্যাপার। হামার লোটাটাভি লিয়ে গেসে। একঠো বর্তন্‌ভি নেই যে রোটি পাকাই।"

আলেক্‌জেণ্ডার বলল, "কে চুরি করেছে বলে তোমার মনে হয়? কাকে তোমার সন্দেহ? যদি তার কোনো হদিশ দিতে পারো তো আমার গোয়েন্দাগিরির সুবিধা হবে।"

কুন্দন বলল, "হামার তো মনে লাগে ঐ যে ম্যাও ম্যাও বোল্‌তেছিল—উসিকা ভিতর কুছ হদিশ আছে। কোনোদিন হামার ঘরে বিল্লি আসে না, কভি আস্‌ছে না, হামি তো বাংগালীর মোতো মছ্‌লি খাচ্ছে না।"

আলেক্‌জেণ্ডার বিস্মিত হয়ে বলল, "বল কি, বিড়ালে সিঁধ কাটবে? তাতে আবার এত বড় সিঁধ? অসম্ভব। তবে যদি বনবিড়াল হয় তো বলতে পারি না। বনবিড়াল আমি কখনো দেখিনি।"

কুন্দন বলল, "না, বিড়াল কেনো কাটবে? চোর ঢুকে বিল্লিকা মাফিক ডাকতেছিল—হামি নিদ্‌তে আছি না জগ্‌তে আছি ওহি জানবার ফিকিরে।"

আলেক্‌জেণ্ডার বলল, "হাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু ও দিয়ে কি আর চোর ধরা যাবে? বিড়াল ডাকা খুবই সোজা, সবাই ডাকতে পারে। আমিও পারি। আচ্ছা, চোরে কোনো হরতনের নওলা কি চিড়িতনের সাতা ফেলে যায় নিতো?"

কুন্দন বলল, "তাস ? নাঃ, উলোক ত তাস খিলতে ইখানে আসেনি, চোরির মতলবেই আসছিল।"

আলেক্‌জেণ্ডার বলল, "তাতো এসেছিল, কিন্তু অনেকসময়ে সামান্য একখানা তাস থেকে বড় বড় চুরির কি খুনের কিনারা হয়ে যায়, তা জানো ? তোমার এই চুরিটা ভারী রহস্যময়। তা, আমি এর রহস্যভেদ করবই করব—চোরদেরও পাকড়াও, তোমার জিনিসও ফেরত পাবে। আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়েছে, আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবুর সঙ্গে কাল কি পরশু তোমার কোনো কথা হয়েছিল ?"

কুন্দন সিং জানালো যে কাল বিকেলেই দেখা হয়েছিল, কুন্দন সিংএর সেলাম্-এর জবাবে তিনি জিগ্যেস করেন, 'কি কুন্দন, ভালো আছো তো ?' এইমাত্র।

হুঁ—ঠিক। এতক্ষণে আলেক্‌জেণ্ডারের মনে ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখা দিল, এইবার যেন রহস্যভেদের মতন হয়েছে। সেই স্টপার চুরি যাওয়ার পর থেকেই দোলগোবিন্দবাবুর ওপর তার সন্দেহ জমেছিল, এইবার সেটা গাঢ় হোলো। ওই যে বসন্তচিহ্নলাঞ্ছিত খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ—এসমস্তই ডিটেক্‌টিভ বইয়ের অপরাধীদের সঙ্গে মিলে যায়। একেবারে হুবহু। খিটখিটে মেজাজের জন্যে ভদ্রলোকের ওপর আলেক্‌জেণ্ডার মনে মনে খাপ্পা ছিল—সে বুঝল যে তার রাগ নেহাত অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি।

আলেক্‌জেণ্ডার গম্ভীর মুখে বলল—

"তোমার চোরাই মাল কোথায় আছে আমি জানতে পেরেছি। কালকের মধ্যেই তুমি সব পাবে, কিন্তু চোরকে আমি ধরে দিতে পারব না, তা কিন্তু বলে রাখছি। কেননা আমার চেয়ে তার গায়ে জোর অনেক বেশি, তাছাড়া সে যে-রকম বদ্‌রাগী লোক, ধরতে গেলে হয়ত আমাকে কামড়েও দিতে পারে।"

কুন্দন কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তার বালক বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলো—"কেটে লিবে। হেমন চোরকে লিয়ে হামার কুনো কাম নাই। কামড় চাই না, হামর মাল ফিরৎ পেলেই হামি খুশি।"

এক রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে আলেক্‌জেণ্ডার হোস্টেলে ফিরে এল। তাহলে এই পাড়ায় যত চুরি হচ্ছে সে সবই তাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ। তিনি একাই করছেন, না, আরো তাঁর দলবল আছে ? লোকটা যেরকম চার্জ নেয় আর যা খারাপ খাওয়ায় তাতে এমন লোকের অসাধ্য কিছুই নেই।

আলেক্‌জেণ্ডারদের এটা প্রাইভেট হোস্টেল। দোলগোবিন্দবাবু ছোটমত

একটা বাড়ী লীজ্ নিয়ে জনা পঁচিশেক ইস্কুলের ছাত্র জুটিয়ে এই বোর্ডিং-হাউস্‌টা ফেঁদেছেন—উপরি উপায় হোক্ বা না হোক্, এর আয়ে কলকাতা শহরে তাঁর খাওয়া থাকাটা নির্বিবাদে চলে যায়।

সেদিন রবিবার ছিল, দোলগোবিন্দবাবু ছেলেদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে স্টীমার ট্রিপের আয়োজন করেছিলেন। ছেলেদের স্বাস্থ্য এবং ফুর্তির জন্যে তাদেরই খরচে মাঝে মাঝে তিনি এই রকম আউটিংয়ের ব্যবস্থা করতেন। আলেক্জেণ্ডার হোস্টেলে ফিরে দেখল আর সব ছেলের ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তারা তৈরি হয়ে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

সে ফিরতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—"ছিলে কোথায় এতক্ষণ? যাও, চটপট খেয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে নাও, দেরি কোরো না।"

আলেক্জেণ্ডার বলল—"আমি যাব না। শরীরটা আমার তেমন ভাল নেই। আমি খাবও না কিছু।"

দোলগোবিন্দবাবু বললেন—"কাল দুপুরে আমরা ফিরব। চাকর বামুনদেরও ছুটি দেওয়া হয়েছে। একলা তুমি থাকতে পারবে?"

আলেকজেণ্ডার বলল—"খুব।"

সে ভেবে দেখল এই চমৎকার সুযোগ। কেউ থাকবে না, সে বিনা বাধায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জিনিস-পত্রের ভেতর থেকে কুন্দনের চোরাই মাল খুঁজে বার করার অবকাশ পাবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে সে তাঁর সাজসজ্জা দেখতে লাগল, কিন্তু তার নজর রইলো তাঁর ঘরের আনাচে কানাচে, দোলগোবিন্দবাবুর মালপত্রের বহরের ওপর। ওই যে ওই কোণটায় একটা পেটমোটা থলে দেখা যাচ্ছে, এটা তো কাল ছিল না—আজ এটা এল হঠাৎ কোত্থেকে? তবে কি এর মধ্যেই কুন্দনের যতো লোটা বর্তন ইত্যাদি—?

মনে মনে আঁচ করল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক মিনিটের জন্যে বেরুলেই একবার উঁকি মেরে থলের ভিতরটা দেখে নেবে, কিন্তু তিনি আদপেই ঘর ছেড়ে নড়লেন না। অবশেষে মরিয়া হয়ে আলেক্জেণ্ডার প্রশ্ন করে বসল, "সার্, আপনি কি বিড়াল ডাকতে পারেন?"

দোলগোবিন্দবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। কথাটা তাঁর কানে যায়নি। তিনি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"অ্যাঁ?"

তাঁর শাণিত কটাক্ষে ঘাবড়ে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে সে বলল—"বিড়ালের ডাক কিরকম তাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"কেন? তাদের সঙ্গে কি তোমার সদ্ভাব নেই? আলাপ করলেই জানতে পারবে।"

তাঁর এই উত্তরে আলেক্‌জেণ্ডার ভারি দমে গেল। বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। সহজে ধরা দেবার পাত্র দোল গোবিন্দবাবু নন্। গল্পের বইয়ে যেমন যেমনটি সে পড়েছে তার সঙ্গে একেবারে লাইনে লাইনে মিলে যাচ্ছে।

আমতা আমতা করে বলল

হুবহু। কিন্তু সেও বইয়ের সেই সব ডিটেক্‌টিভের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না,—দোলগোবিন্দবাবুকে বাজানো সহজ নয় সে বুঝল, কিন্তু তারও এই প্রতিজ্ঞা, দোলগোবিন্দবাবুকে ঢোলগোবিন্দ করে তবে সে ছাড়বে।

দোলগোবিন্দবাবু নিজের ঘরে চাবি এঁটে তালা টেনে পরীক্ষা করে চারি ধারে চুরির উপদ্রবের কথা উল্লেখ করে, কুন্দন সিংএর বাড়ীর কালকের উদাহরণ দেখিয়ে আলেক্‌জেণ্ডারকে সাবধান থাকবার উপদেশ দিয়ে আর সব ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ওকে একটা টাকা দিয়ে গেলেন দরকার মত খরচ করবার জন্যে, এবং সেই সঙ্গে এও বলে গেলেন, সে আলুকাব্‌লি, ফুচ্‌কিয়া, আজে বাজে দোকানের চপকাটলেট ইত্যাদি খেয়ে অসুখ যেন আরো না বাড়ায়।

কতকগুলো চাবি যোগাড় করে আলেক্‌জেণ্ডার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দরজার তালা খোলার কাজে মন দিল। কিন্তু তাঁর সেই প্রচণ্ড রামতালা কিছুতেই খোলবার নয়। চাবিগুলো ঘসে মেজে তৈরী করতেই সমস্ত দুপুরটা তার গড়িয়ে গেল, কিন্তু কোনো চাবিই তালায় লাগল না। সারাদিন খেটে হয়রান হয়ে তার ভারি খিদে পেয়েছিল। বিকেলের দিকে টাকাটা পকেটে নিয়ে খাবারের খোঁজে রাস্তায় বেরুল সে।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ইচ্ছেমত চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে বেড়িয়ে টেড়িয়ে যখন হোস্টেলে ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

হোস্টেলের ভিতর পা দিতেই বুকটা তার ছাঁত করে উঠল। চাকর-বাকরের ছুটি সেদিন, কেউ কোথাও নেই, আলোও জ্বলেনি। চার ধারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাদের হোস্টেলে ইলেক্‌ট্রিক্ কনেক্‌শন্ ছিল না, কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলত। কোন রকমে হাত্‌ড়ে মাত্‌ড়ে সে সিঁড়ির কাছে এল। অন্যদিন এই সময়ে ছেলেদের সোর-গোলে কিরকম জম্‌জমাট্ থাকত, আর আজ কী ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। বুকটা তার গুড় গুড় করে উঠল—এক ছুটে সে দোতলায় তার নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল্ এঁটে দিল।

ল্যাম্প্? ওই যা—তার ল্যাম্প্‌টা তো নীচে রান্নাঘরে রয়েছে, তেল আনতে সকালে দেওয়া হয়েছিল। দেশলাই একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা যে কোন্‌খানে, এই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া দায়। তার স্মরণ হল যে সদর দরজা বন্ধ করে আসা হয়নি। থাক্ গে খোলা পড়ে। লাখ টাকা দিলেও সে আর নীচে নামছে না।

কী করবে—আলেক্‌জেণ্ডার খানিকক্ষণ বিছানার ধারে চুপ করে বসে ভাবলো—ঘরের জমাট অন্ধকারে চোখ চালিয়ে দেখল কত কি যেন অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি! ভূতের তার ভারী ভয়—এবং অন্ধকারে ভূত ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না। চোখ বুজে কোনরকমে চাদরটা খুঁজে নিয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল পাশের ঘরে কে যেন পড়ে গেল দড়াম করে। আলেক্‌জেণ্ডারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। তারপরেই একটা চাপা হাসির আওয়াজ! সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে কারা। কারা যেন তেতলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গট্‌গট্ করে।

বাঘের চেয়ে ভূত ভয়াবহ! ভূতের সান্নিধ্য থেকে একটা খুনের সঙ্গ পেলেও লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিছুদিন আগে একটা ছেলে এই হোস্টেলে মরেছিল সেই কথা তার মনে পড়ল। না, আর এখানে—এক-মুহূর্ত নয়। তাহলে আলেক্‌জেণ্ডারকে কালকে আর দেখতে হবে না। সে নিজেই আরেকটা ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আলেক্‌জেণ্ডার খিল্ খুলে চোখ-কান বুজে একছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল; তার মনে হল ভূতেরা যেন তার পিছু পিছু তাড়া করে আসছে। রাস্তায় নেমেই সে সদর দরজাটা বাইরে থেকে এঁটে দিল। দিয়েই নিকটবর্তী গ্যাস্-পোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল—না, অত আলোয় ভূতের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে একটা বাড়ীর রোয়াকে বসে ভূতুড়ে বাসাটার দিকে সে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। তার মনে হতে

লাগল দোতলার তেতলার ঘরগুলোতে কী-সব যেন অস্পষ্ট ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু আলোর প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে অন্ধকারের ভূত দেখতে ভালই লাগে, ভয় করে না।

ভোরের দিকে একজন পুলিস কর্মচারী ওই পথে সাইকেলে যেতে যেতে আলেক্‌জেণ্ডারকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

আলেক্‌জেণ্ডার বাড়ী দেখিয়ে দিল।

"তবে এখানে বসে আছো কেন?"

"ওখানে ভারী ভূতের উপদ্রব। তাই পালিয়ে এসেছি।"

"আর কেউ নেই বাড়ীতে?"

"না; সবাই বেড়াতে গেছে বাইরে।"

"দেখি কেমন ভূত?" বলে পুলিস কর্মচারী হুইস্‌ল্‌ দিয়ে জনকয়েক কনস্টেবল ডাকলেন; তার পরে শেকল খুলে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন। আলেক্‌জেণ্ডারও সঙ্গে সঙ্গে গেল। কারণ তার ধারণা ছিল ভূত যদি পৃথিবীতে কারুকে ভয় করে তো সে পুলিস! অতএব পুলিস সঙ্গে থাকলে ভূতের ভয় কিছু নেই! তাছাড়া এখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। দিনের বেলায় ভূত বলে কিছু আছে কি!

দোতলায় উঠে দেখা গেল, প্রত্যেক ঘরের বাক্স-পেঁটরা সব ভাঙা পড়ে আছে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আলেক্‌জেণ্ডার খুব আশ্চর্য হল। ভূতে ত ঘাড়ই ভাঙে জানা ছিল, বাক্সও আবার ভাঙে নাকি? তেতলায় উঠে দেখা গেল, একটা ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র একত্র করে জড়ো করা, আর তারই পাশে বসে দুজন লোক কী যেন পরামর্শ করছে।

ইন্‌স্‌পেক্টার বললেন—"ভূত নয়, চোর। ফাঁকা বাড়ী পেয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তুমি বুদ্ধি করে বাইরে থেকে শেকল এঁটে দিয়েছিলে বলে আর বেরুতে পারে নি। এখন বুঝতে পারছি—এ পাড়ায় এতদিন যত চুরি হয়েছে সে সব কাদের কীর্তি।"

চোর দুজন গ্রেপ্তার হয়ে থানায় গেল। এবং সেখানে গিয়ে তারা সমস্ত কবুল করল, তার ফলে তাদের দলের আরো কজন ধরা পড়ল, অনেক চোরাই মালও বার হোলো। কুন্দন সিং তার বর্তন, লোটা এবং আর যা যা গেছল—ফিরে পেল সব। ও পাড়ার আরো সব চুরির অনেক জিনিস উদ্ধার হল, চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা পর্যন্ত পাওয়া গেল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছেলেদের নিয়ে স্টীমার ট্রিপ থেকে ফিরে আলেক্‌জেণ্ডারের দিগ্বিজয়কাহিনী শুনলেন। শুনে তিনি যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি আনন্দিত

হলেন। তাঁর ঘরেরও তালা ভেঙেছিল এবং সেই থলেটাও সেইখানে ছিল; কিন্তু আলেক্জেণ্ডারের আর তার ভেতরে উঁকি মারার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

দোলগোবিন্দবাবু আলেক্জেণ্ডারের পিঠ চাপ্‌ড়ে বললেন—"বাহাদুর ছেলে! আমি ভাবি কী সব ছাই পাঁশ পড়ো! কিন্তু না, গোয়েন্দাগিরি করে ধরেছ ত ঠিক! এই সব দুর্ধর্ষ চোরের জ্বালায় পাড়া অস্থির, পুলিস পর্যন্ত নাস্তানাবুদ! এইটুকু ছেলেতে চোর ধরেছে কম কথা নয়। না, ডিটেক্‌টিভ বই পড়লে বুদ্ধি পাকে একথা মানতেই হবে, তুমি বইগুলো দিয়ো আমায়, এবার থেকে আমিও পড়ব।"

আলেক্জেণ্ডার বলল—"না সার্, ওসব বই পড়লে বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায় বরং। এত লোকের ওপর এমন আজেবাজে সব সন্দেহ হয় আর এরকম ভুল বোঝায়! ওতে আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা। না, আমি ঐসব ডিটেক্‌টিভ বই আর পড়ছি না।"

কুন্দন সিংএর আনন্দ আর ধরে না, সে এসে আলেক্জেণ্ডারকে খাবার নেমন্তন্ন করে গেল। ভোজপুরি বন্ধুর পুরির ভোজ সম্ভবতঃ সে ঠেলতে পারবে না।

———

● অবাক হয়ে শোন

বেলজিয়মের শিল্পী চার্লস্ ফেলু। খুব ছেলেবেলাতেই তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর হাত দুটো। কিন্তু শুধুমাত্র পা দিয়েই তিনি ছবি এঁকে আজ জগতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিচিত হয়েছেন। শিল্পী ফেলুর অনেক বন্ধু আছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তিনজন রাজা—একজন সম্রাট্। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি পা দিয়েই সেক্-হ্যাণ্ড করেন।

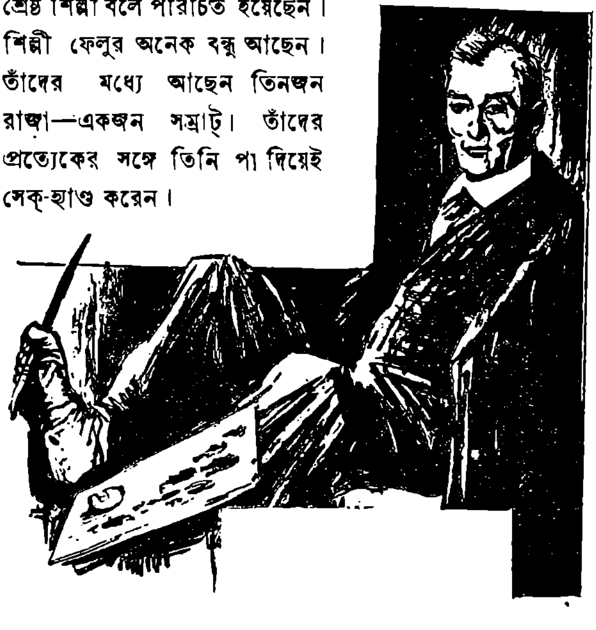

শকুনি-দেবতা

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল দীপক।

বেশীদূর দৃষ্টি চলে না কোনদিকেই—বাধা পায় রুক্ষ, শুক্‌নো পাহাড়ের প্রাচীরে। সে পাহাড়ে না আছে জল, না আছে কোন খাদ্য। একটা গাছ নেই যে তাতে ফল ধরবে; একটা পশু বা পাখী নেই যে মেরে উদরে দেওয়া যাবে।

পাখী নেই?—একটা আছে। দূর আকাশে উড়ছে একটা শকুন। আজ দু'দিন থেকে দীপক তাকে মাথার উপর দেখতে পাচ্ছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। অলক্ষুণে পাখীটা জানে যে দীপকের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে; ঠিক তাই নজর রেখেছে তার উপরে; ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষায় আছে—কবে কোন্ মুহূর্ত্তে ঠুকরে ঠুকরে তার দেহের মাংস ছিঁড়ে খেতে পারবে।

দীপক আর পারে না। আজ চারদিন উপবাসী। এক মাসের উপর ঘুরছে এই মরুপাহাড়ের দেশে। বেরিয়ে লোকালয়ের পানে যাওয়ার কোন পথ পায় নি; সাদা কালো সভ্য অসভ্য এমন একটাও মানুষ চোখে পড়ে নি, যার কাছে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে পারে। উপর-আকাশে দু'একখানা প্লেন মাঝে মাঝে দেখেছে বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করবে কেমন ক'রে?

ইংরেজ-ফরাসী যখন সুয়েজখালে হানা দিল, ভারত থেকে এল একদল স্বেচ্ছাসৈনিক। ভারত সরকারের তরফ থেকে নয়, নিজেরা এসে বেসরকারী ভাবে যোগ দিল মিসরের সৈন্যদলে। দীপক ছিল বিমানচালক, মিসর সরকার আদর করেই নিলেন তাকে।

একদিন তাকে বেরুতে হ'ল এক মিসরী সহকর্ম্মীর সাথে। টহলদারীর কাজ। ফরাসীরা কোথায় সৈন্য নামাচ্ছে, কোথায় মজুদ করছে রসদ—আকাশ থেকে লক্ষ্য করতে হবে। দারুণ বিপদের কাজ। শত্রুর বিমান আকাশে ঘুরছে ঝাঁকে ঝাঁকে, বিমান ঘায়েল করবার কামান মুখ উঁচিয়ে আছে নীচের মাটিতে। এদের নজর এড়িয়ে উপর-আকাশে ঘোরাফেরা করা এ যেন মৃত্যুর সাথে লুকোচুরি খেলা।

সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত বিপদ ঘটল। নীচের কামান থেকে গোলা ছুটল দীপকদের উপর তাক ক'রে। ভয়ানক জখম হ'ল প্লেনের ডানা। তারই একটা ভাঙ্গা টুকরো এসে বিঁধলো দীপকের সাথীর চোখে; সে কাত হয়ে প'ড়ে গেল চোখ চেপে ধ'রে।

একা দীপক ভাঙ্গা প্লেন কোনমতে সোজা রেখে পালাতে লাগল। যেদিকে যাওয়া দরকার, সেদিকে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। উল্‌টো দিকে গিয়ে পড়ল অনেকদূর। তারপর নামাতে হ'ল প্লেন। ও আর চলে না।

যেখানে নামল—সেটা যে কোন্ জায়গা—কোন আন্দাজই করতে পারল না দীপক। মিসরী বন্ধুকে নাড়াচাড়া ক'রে দেখল—সে ততক্ষণে মরে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, প্লেনের দিগদর্শন যন্ত্রটিও গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে ভাঙ্গা ধাতুপিণ্ডের ঘা লেগে।

সেই থেকে দীপক ঘুরছে, আজ এক মাসের উপর। টহলে বেরুবার সময় সব প্লেনেই কিছু খাবার আর জল নিয়ে বেরোয়। দু'জন লোকের এক হপ্তার রসদ দীপক পেয়েছিল প্লেনের ভিতর। তাই পিঠে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল, মিসরী বন্ধুর দেহটা বালির ভিতর কবরস্থ ক'রে।

সেই খাবার আধপেটা ক'রে খেয়ে এতদিন একরকম চলেছিল। আজ চারদিন একেবারে নির্জ্জলা উপোস। এদিকে, কোথায় যে সে এসে পড়েছে, কোন্ পথে যে সে চলেছে—তা সে জানে না। দুস্তর মরুপাহাড়! চোখ ঝল্‌সে যায় দিনের রৌদ্রে; রাতে লাগে বিষম ঠাণ্ডা। দেহমন ভেঙ্গে পড়েছে তার।

কাল থেকে লক্ষ্য করেছে—মাথার উপরে ঐ শকুনিটা। দিন তা হ'লে সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে?

* * * *

আর পারা যায় না। একখানা চওড়া পাথরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল দীপক। চোখ বুজে এল দারুণ অবসাদে।

হয়ত মিনিট পাঁচেক এইভাবে সে চোখ বুজে পড়েছিল। হঠাৎ কী জানি কেন চমক ভাঙ্গল তার। চোখ তাকিয়েই দেখে শকুনিটা উপর-আকাশ থেকে নেমে এসেছে এরই মধ্যে। মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত উপরে সে এখন হাওয়ায় নিশ্চল হ'য়ে ভাসছে; তার চোখের শাণিত দৃষ্টি শুয়ে শুয়েই স্পষ্ট দেখতে পেল দীপক।

একটা চিন্তা চমক দিয়ে গেল দীপকের মাথায়। খাদ্য বিনা সে মরতে বসেছে। অচিরে তাকেই খাদ্য হ'তে হবে ঐ শকুনির। কিন্তু পাশা উল্‌টে দেওয়া যায় না? মানুষের মাথা ভগবান্ ত' দিয়েছেন তাকে!

সে চোখ বুজল আবার। নিশ্চল! নিথর!

পাঁচ মিনিট! দশ মিনিট! বিশ মিনিট!

নামছে! চোখের কোণ একটুখানি খুলে দীপক দেখল—পাখীটা একটু একটু ক'রে নামছে! খুব ধীরে! খুব সাবধানে! লোকটা সত্যিই মরেছে কিনা, নিশ্চিত হতে চায় ও।

ক্ষিধেতে বত্রিশ নাড়ী পাক দিচ্ছে দীপকের। আর দেরী সয় না! সয় না! হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে; চোখের পলকে পকেট থেকে পিস্তল বার ক'রে শকুনিটাকে গুলি করল সে।

মাত্র হাত দশেক উপরে স্থির হ'য়ে ভাসছিল পাখীটা। উড়ে পালাবার সময় সে পেল না। গুলি তার বুকে বিঁধল গিয়ে। একটা ডিগবাজি খেয়ে দীপকের সমুখেই সে প'ড়ে গেল।

ছুরি বার করল দীপক। গলাটা কেটে ফেলে সেই শকুনির তাজা রক্ত সে পান করতে লাগল। মাংসটা সে পুড়িয়ে খাবে। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ এই যে বুক শুকানো, ঠোঁট চৌচির করে দেওয়া তৃষ্ণা—এটা ত' মিটুক আগে!

* * * *

আবার যখন চলতে সুরু করল দীপক, তখন সে নতুন মানুষ। দেহে নতুন শক্তি, মনে নবীন উৎসাহ!

বেশীদূর যায় নি, এমন সময় ও কি শব্দ ?

এক মাসের উপর কেশব্দ সে শুনতে পায় নি, সেই শব্দ ! মানুষের কণ্ঠস্বর ! একজন না, অনেকে যেন কথা কইছে !

কী ভাষায় কথা কইছে ওরা ? ইংরেজী ফরাসী মিসরী আরবী নয় ! কিন্তু দীপকের একেবারে অজানা নয় ও ভাষা। হয়েছে ! ও হিব্রু ! সখ ক'রে অনেকদিন হিব্রু পড়েছিল দীপক ; সে-সখ যিনি মাথায় চাপিয়েছিলেন, সেই খেয়ালী ভগবান্‌কে সে প্রণাম জানাল মনে মনে।

"দেবতা গেলেন কোথায় ?"—অনেক লোকে সমস্বরে চীৎকার করছে। খুব নিকটেই। একটা অল্প উঁচু টিবির এপাশে দীপক, ওপাশে ওরা।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দীপক। অন্য দুই একটা টিবি বেষ্টন ক'রে, ঘুরে যেখানটাতে গিয়ে সে দাঁড়াল, সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় লোকগুলিকে।

ইহুদী অনেক দেখেছে দীপক। ঘষা-মাজা সাহেব-সাজা ইহুদী নয়, খাস ইহুদীর দেশের সাধারণ চাষী মজুর কারিগর শ্রেণীর ইহুদী। তাদের সঙ্গে এই দলটির আকারে প্রকারে কোনই তফাৎ নেই।

কিন্তু এরা এখানে করে কী ? এই মরুপাহাড়ের মাঝখানে, জন পনেরো লোক কোন্ দেবতার খোঁজে ব্যস্ত ?

"দেবতা গেলেন কোথায় ? দেবতা গেলেন কোথায় ?"—সবাই মিলে চীৎকার করছে, আর তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। ঘুরে ঘুরে আকাশের সমস্তগুলো দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে—যেন দেবতা লুকিয়ে পড়েছেন মেঘের আড়ালে।

হঠাৎ আর একটা চিন্তার চমক দীপকের মাথায়। ঐ শকুনিটাই ওদের দেবতা ছিল না ত' ?

অসম্ভব কী ? অনেকদিন আগে টাইমস্ কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছিল, তা' বেশ মনে আছে দীপকের। লেখক বলতে চেয়েছিলেন—আফ্রিকা-এশিয়ার সীমান্তবাসী উপজাতিদের মধ্যে অনেকেরই পেশা দস্যুবৃত্তি, আর সেই সব দস্যুর দেবতা হ'ল শকুনি পাখী। ধর্ম্মে মুসলমান হ'ক, খৃষ্টান বা ইহুদী হ'ক, একেশ্বর পূজার পাশে পাশে শকুনি-পূজা চালিয়ে যেতে এসব দস্যুর বিবেকে বাধে না। ঠিক যেন হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী ডাকাতের কালী-পূজা।

কিন্তু এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহ'লে ত' নিজের অজান্তে দীপক এদের কাছে এক অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়েছে ! তাদের দেবতা যে এখন দীপকের উদরে, এ-কথা জানতে পারলে কি আর দীপককে আস্ত রাখবে এরা ?

কিন্তু, চিন্তা করবার বেশী সময় এখন নেই। ওরা ও বলাবলি করছে কী ? কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল দীপক।

এক বুড়ো ইহুদী একটা উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করেছে। দীপক তার অনেক কথা না বুঝলেও মোটামুটি অর্থটা মগজে ঢুকল বই কি ! বুড়ো বলছে—"দেবতা যখন আকাশে দেখা দেন, তখন 'মাংরু-মাকো' লড়াইবাজদের লড়াইয়ে বেরুবার সময়। কিন্তু দেখা দিয়ে হঠাৎ যদি তিনি অদর্শন হন, তাহ'লে বুঝতে হবে—আগামী লড়াইয়ে অশুভ ফলের সম্ভাবনা আছে।"

গোটা দলটার মুখ থেকে একটা গোঙানি উঠল !

বুড়ো ব'লে চলল—"এ-রকম ঘটনা ঘটলে কী আমাদের করা উচিত—তা তোমরা জান। রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবার একটা উপায় আছে ; তাঁর সমুখে নরবলি দেওয়া। মানুষের রক্তমাংস উৎসর্গ করতে পারলে দেবতা আবার দেখা দেবেন। কোন গোলামকে এখুনি বলি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের।"

দলের ভিতর থেকে আর এক বুড়ো ব'লে উঠল—"কথা খুবই খাঁটি। চিরকাল এই উপায়েই আমরা দেবতাকে খুশী রেখে আসছি। কিন্তু আজ ত বড় মুস্কিল ! অনেকদিন লড়াইয়ে বেরুনো হয় নি ! একটাও বন্দী নেই আমাদের হাতে ! বলি দেব কাকে ?"

"লড়াই" অর্থে এখানে দীপক বুঝল—ডাকাতির অভিযান!

এই দ্বিতীয় বুড়োর কথা শুনে গোটা দলটার ভিতর থেকে দ্বিতীয়বার উঠল একটানা গোঙানি।

কিন্তু প্রথম বুড়ো তাদের হতাশ কান্নায় কান দিল না ! সে রুখে উঠে বলল—"বন্দী নেই মানে কী ? আর কেউ না থাক, আদম ত রয়েছে ! তাকেই উৎসর্গ করতে হবে এ-যাত্রা।"

"আদম ?"—সবাই অবাক্ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রথম বুড়ো বলল—"অবাক্ হবার আছে কী ? সে কি গোলাম নয়? তাকে কি একদিন যুদ্ধে বন্দী ক'রেই ধ'রে আনেন নি বাপ-জ্যাঠারা ? হ'তে পারে যে সে আজ ত্রিশ বছর আমাদের সেবা করেছে ; আপদে-বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছে ঠিক একজন বীর মাংরু-মাকোর মতনই। তার জন্য আমরা তাকে ভালবেসেছি, যত্ন করেছি, কী আমরা করি নি তার জন্যে ? কিন্তু আজ যে ঘোরতর বিপদ আমাদের সমুখে ! দেবতাকে খুশী করতে না পারলে এবারকার মরশুমটাই যে নিষ্ফলা যাবে আমাদের ! না আসবে ঘরে খাবার-দাবার, না আসবে সোনাদানা, না আসবে বান্দা-বাঁদী ! না খেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল, না, একটা গোলামের মায়া ত্যাগ করা ভাল ?"

এ-বক্তৃতার উত্তরে যে বিকট চীৎকার উঠল এবার গোটা দলটা থেকে, সে আর হতাশার আর্তনাদ নয়, মরিয়া লোকদের জয়ধ্বনি। আর সেই ধ্বনির রেশ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই—

দেখা গেল একটা আধাবয়েসী লোক প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে পাহাড় ভেঙ্গে। ছুটছে, আর পিছনপানে ফিরে ফিরে চাইছে এক এক বার। ঐ লোকটাই যে সেই আদম, তা বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরী হ'ল না দীপকের।

আদমকে পালাতে দেখে মাংরু-মাকোরা ছেলে-বুড়ো সবাই ছুটল তার পিছনে ! ইংরেজদের শেয়াল-শিকারেও এমন হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি দীপক দেখে নি কখনো। ডালকুত্তার জিঘাংসা নিয়ে সেই পনেরো কুড়িটা লোক পলাতকের পিছনে ছুটেছে, যে-পলাতক কয়েক মিনিট আগেও তাদেরই উদরের জ্বালা মেটাবার জন্যে রুটি গড়ছিল গুহায় বসে।

মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল আদম। তাইতেই হ'ল তার কাল। হোঁচট খেয়ে সে প'ড়ে গেল। আর, আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই—

বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দশ বিশ জন, যারা এই কয়েক মিনিট আগেও ছিল আপন জন ছিল তার।

* * * *

দীপক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই ঢিবির আড়ালে। দেখছে আর ভাবছে। সমুখে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, এ সময়ে তার করণীয় কী?

হাত-পা বেঁধে আদমকে ফেলে রাখা হয়েছে। সে কখনো কাঁদছে হাপুস-নয়নে, কখনো বা তারস্বরে অভিশাপ করছে, মাংরু-মাকোদের নাম ধ'রে ধ'রে। তার ভাষা শুনে দীপকের মনে হ'ল—এ-লোকটা মিসরী।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে দীপক। ওদিকে একটা গুহা। সম্ভবতঃ এই দস্যুদের বাসস্থান।

লক্ষ্য করেছে আরও একটা জিনিস। দস্যুদের হাতে একটাও বন্দুক নেই। অথচ এ-যুগের দস্যুরা বন্দুকবর্জ্জিত হবে, এমন আশা সে করতে পারে না। নিশ্চয়ই বন্দুক আছে ঐ গুহার ভিতর।

এরা সব একটা কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। সেই প্রথম বুড়ো আদমের চারি পাশে ঘুরে ঘুরে কখনো বিড়বিড় ক'রে, কখনো-বা চেঁচিয়ে মন্তর পড়ছে ঝড়ের বেগে, আর বিশেষ বিশেষ জায়গায় দলশুদ্ধ লোক ধুয়া ধরছে গলা ফাটিয়ে। এমন মশগুল হয়ে আছে ওরা যে ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি যদি চুরি ক'রে নেয় কেউ, এই মুহূর্ত্তে তা ওরা টের পাবে না!

ঠাহর ক'রে ক'রে দীপক দেখল—পাথরের ঢিবির আড়ালে আড়ালে ঘুরপথে গুহায় পৌঁছানো সম্ভব হ'তে পারে।

* * * *

মন্ত্র-পড়ার পালা শেষ ক'রে প্রথম বুড়ো একখানা বেঁটে খাঁড়া হাতে এগিয়ে এল। আদমের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে হাঁটু গেড়ে বসানো হয়েছে। পিছন থেকে চেপে ধ'রে আছে চারজন পালোয়ান; আর তার লম্বা চুলের ঝুঁটি সামনে থেকে টেনে ধ'রে আছে আর একজন। ঠিক গলার নীচে একখানা পাথর ঠেক্‌নো দেওয়া আছে,—যাতে মাথাটা খাড়া থাকতে পারে!

খাঁড়া হাতে ক'রে পুরোহিত বুড়ো আদমের পাশে দাঁড়িয়েছে। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মাংরু-মাকোর দল, আর খাঁড়া তুলল পুরোহিত।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

গুড়ুম!

বন্দুকের গুলি বিঁধল বুড়ো পুরোহিতের বুকে।

সে পিছন দিকে প'ড়ে গেল চিৎ হয়ে।

লাফিয়ে উঠল সবাই। হতভম্ব হয়ে চাইতে লাগল চারিদিকে। তারপর গুহার দিকে দৃষ্টি পড়তেই একপাল সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে উঠল তারা।

দীপক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

সবাই তখন লুকিয়ে পড়ল টিবির আড়ালে আড়ালে। আর আদম লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল দীপকের দিকে। মিসরী ভাষায় তাকে বলল—তার মর্ম্ম এই যে—"তুমি আমায় বাঁচাও! তুমি আমার বাবা, তুমি আমার ফারাও, তুমি আমার আম্মন-দেবতা!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে······ [পৃঃ ৩৭৪

আদমও বন্দুক ছুঁড়তে জানে। দু'জন বন্দুকধারী একদিকে, আর নিরস্ত্র পনেরোটা মাংরু-মাকো অন্যদিকে। ডা কা তে র দলের কতক মরল, কতক পালাল।

তখন আদম দেখাল—গুহার মেঝেতে লুকানো রয়েছে সাত রাজার ধন, দস্যুদের বহু যুগের লুঠের মাল। সব খুঁড়ে তুলে অন্য জায়গায় পুঁতে রাখল দীপক। মিসর সরকারের লোক আদমকে সঙ্গে নিয়ে এসে এই সব অর্থ তুলে নিয়ে যাবে—এই তার মতলব।

আপাততঃ ডাকাতদের সংগৃহীত সমস্ত রসদ আদমের মাথায় চাপিয়ে সে মিসরের পানে রওনা হ'ল; নিজের ভাগে বোঝা রাখল শুধু দুটো রাইফেল।

মিসরে ফিরবার পথ?—আদম তা জানে।

সোনার ভারত

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

শেষ অগ্নিশিখা

নন্দকুমারের আত্ম-ত্যাগ ব্যর্থ হয় নি—ব্যর্থ হয় নি তাঁর দেশপ্রেম···

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে···

যে বিষবৃক্ষের মূল দৃঢ় থেকে হচ্ছিল দৃঢ়তর, তা' বুঝি পুড়ে হয় ছারখার!

চতুর ওয়েলেসলি বুঝতে পারেন—বুঝতে পারেন, ভারতবাসীদের সঙ্গে এখন যুদ্ধ করার অর্থ ইংরেজ-হত্যারই নামান্তর! সম্মুখ-যুদ্ধ না ক'রে তিনি ধরলেন কূটনীতির কুটিল পথ। কৌশলে বন্ধুত্বের জাল বিস্তার ক'রে অনেক দেশীয় রাজাকেই নিজের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন তিনি।

কিন্তু বাধা এল সুদূর দক্ষিণ থেকে।

"কে ঐ ইংরেজ?···দুই বাহুতে ধরে সে কত বল?···ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়েছে কপট ইংরেজ···কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব আমরা···ফরাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাড়াব সাগর-পারের ঐ দস্যুদের।"

মহীশূররাজ টিপুর বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠ হয় ধ্বনিত।

প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর বাণীঃ "ইংরেজের বন্ধুত্বের অর্থ তার দাসত্ব স্বীকার।"

মিলিত হিন্দু-মুসলমান সৈন্য নিয়ে নবাব এগিয়ে যান ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

১নং চিত্র। দেশের রাজারা করছে অধীনতা স্বীকার।
২নং চিত্র। "কে ঐ ইংরেজ..."
৩নং চিত্র। বিদ্রোহী পঞ্জাব-কেশরী।

কিন্তু বৃথা দুরাশা!

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন আত্মঘাতী ভারতের অন্তরাত্মা বুঝি হ'য়ে পড়েছে হীনবল! বিশ্বাসঘাতকতার শাণিত অস্ত্রে রক্ত-রাঙা ক্ষত-চিহ্ন দগদগ করে তার বুকে। জগতের হিতবুদ্ধি নিয়ে যে ভারতবাসী সভ্যতার প্রথম ধাপে পা দিয়েছিল একদিন, তার মনে ঢুকেছে বুঝি নীচতা…হীনতা!

নবাব সিরাজকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকের নির্ম্মম ছুরিকাঘাতে।

টিপুকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয় নিজ পক্ষের হীন ছলনায়।

টিপুর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদলের সামনে ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে থাকে। নবাবের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জানিয়ে দেয় শত্রুকে গুপ্ত পথ।

নদীর পরপারে কামান সজ্জিত করে ইংরেজ।

ছুটে আসেন টিপু। নদীর এপারে সৈন্য সাজাবার আগেই কিন্তু পার হয়ে মহীশূরে প্রবেশ করে শত্রু। ইংরেজের হাতে বন্দী হ'য়ে প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে রণস্থলে ইংরেজের গুলিতে লুটিয়ে দিলেন নবাব তাঁর প্রাণহীন দেহ।

কলকাতার পার্শ্ববর্ত্তী টালিগঞ্জে স্থান হয় টিপুর বংশধরদের। মহীশূরে থাকার তাদের অধিকারটুকুও সেদিন কেড়ে নিয়েছিল দস্যু ইংরেজ!

সুদূর দক্ষিণ থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম।

টিপু সুলতান অস্তমিত…কিন্তু পঞ্জাবে শোনা যায় সিংহ-গর্জ্জন।… রণজিৎ সিংহের হুঙ্কার-ধ্বনি। মাথায় কোহিনুর প'রে দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্য নিয়ে যেখানেই যান, বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন পঞ্জাব-কেশরী।

ভবিষ্যৎ-দর্শী রণজিৎ সিংহ…

ইংরেজকে কিন্তু এড়িয়ে চলেন তিনি…বুঝতে পারেন ইংরেজকে রুখবার ক্ষমতা ভারতবাসীর আর নেই। ভারতের মানচিত্র দেখতে দেখতে একদিন বলেছিলেন তিনিঃ সব ভি লাল হো যায়েগা…ভারতে ইংরেজ আধিপত্য আসন্ন।

দুর্ভাগা ভারত…পঞ্জাব-কেশরীর মৃত্যুর পর তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে হয়েছিল সত্য!

[ক্রমশঃ

খেলার আসর

—শ্রীসাংবাদিক

ইষ্টবেঙ্গলের বাইটন কাপ লাভ—এবারে বাইটন কাপটি লাভ করেছে কলকাতার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কলকাতারই মহোমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে এই প্রথম বাইটন কাপ লাভ করল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩য় রাউণ্ডে ঝাড়খণ্ড দলকে ৪-০ গোলে, কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাবকে ২-০ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে উত্তর প্রদেশ দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে ওঠে।

১৯৩০ সালের পর বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় আবার কলকাতারই দুটি টীমকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেল। ঐ সালে কাষ্টমস দল ৪-২ গোলে পোর্ট কমিশনার্স দলকে হারিয়ে দিয়ে বাইটন কাপ লাভ করেছিল।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বলেই লোকে জানে। কিন্তু এবারে বাইটন কাপ লাভ করে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব হকি খেলাতেও কৃতিত্ব দেখালো।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজে. সি. গুহ বাইটন কাপ বিজয়ী খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা সভায় কয়েকটি ভাল কথা বলেছেন। তিনি বলেন—"একটি ক্লাবের পক্ষে সবরকমের খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। খেলাধূলার জগাখিচুড়ীর মধ্যে কোন খেলাতেই চরম উন্নতি করা যায় না। কোন একটি খেলায় নাম করতে হলে, সেই খেলার জন্যে কুশলী খেলোয়াড় গড়ে তুলতে হলে, সেই খেলাকেই প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে তারই সাধনায় কাল কাটাতে হবে—গড়ে তুলতে হবে কৃতী ও গুণী খেলোয়াড়।" এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন—"ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এক একটি ক্লাব এক একটি খেলার সাধনায় মগ্ন থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের দুই একটি ক্লাবের নাম করা যেতে পারে, যারা একটি খেলার মধ্যেই নিজেদের মাতিয়ে রেখেছেন। যেমন বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ও হায়দারাবাদের সিটি পুলিশ ক্লাব। টাটা স্পোর্টস ক্লাব হকি খেলাতে আর হায়দারাবাদ সিটি পুলিশ ক্লাব ফুটবলে খুবই নাম করেছে।" জানি না, ভারত যে কোন খেলাতেই ভাল ফল দেখাতে পারছে না, তার কারণ ঐ জগাখিচুড়ীর মেলা কি না।

আমাদের দেশে দিন দিন হকি খেলার মান খুবই নীচে নেমে যাচ্ছে। আবার বাংলার যেটুকু নাম আছে তাও অবাঙালী খেলোয়াড়দের দৌলতে। যে কয়টা নামকরা ক্লাব হকি লীগ প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে ছিল, তাদের মধ্যে কাষ্টমস ও মহোমেডান স্পোর্টিংকে বাদই দিলাম। কিন্তু এবারকার লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব ও লীগ-রাণার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে কয়টি বাঙালী খেলোয়াড় আছে তাদের নাম ধরা যাক। মোহনবাগানে আছে একটিমাত্র খেলোয়াড় ভোলা চক্রবর্ত্তী—তাও তিনি প্রবাসী বাঙালী। আর ইষ্টবেঙ্গলে আছে মাত্র দুইটি খেলোয়াড়—বি. দফাদার ও রবি দাশ। বাইরের গুণী খেলোয়াড়রা এসে বাংলার হকি খেলার সমৃদ্ধি করুন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এও আমরা দেখতে চাই, বাঙালী খেলোয়াড়রা বাইরের গুণী খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হোন। বাংলা দেশে যেমন বাইরের প্রদেশের খেলোয়াড়দের দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি অন্য প্রদেশেও বাঙালী খেলোয়াড়দের স্থান হোক।

এবারে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় ৩০টি দলকে যোগদান করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে বাংলার বাইরে থেকে মোট ৮টি দল খেলতে এসেছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের শক্তিশালী দলের দেখা পাওয়া যায় নি। ভারতীয় হকি-ক্ষেত্রে রেলওয়ে, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের দু'একটি ক্লাবের নাম করা যেতে পারে। এদের মধ্যে বোম্বাইয়ের একটি টীম ও সেণ্ট্রাল রেলওয়ে টীম বাইটন কাপে অংশ গ্রহণ করেও খেলতে আসেনি। ভারতে যে কয়টি নামকরা হকি প্রতিযোগিতা আছে, তাদের খেলা প্রায় সবই একসঙ্গে আরম্ভ হওয়ার দরুণ এবারে কলকাতায় ভাল টীমের দেখা পাওয়া যায়নি। ভারতীয় হকি ফেডারেশন যদি এদিকটা একটু লক্ষ্য করে তাহলে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে পয়সা খরচ করে দর্শকরা একটু আনন্দ পান।

ফুটবল মরশুম আরম্ভ—গত ৮ই মে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আর প্রতি খেলাতেই দর্শকরা মাঠের অনেকটা অংশ ভরিয়ে রেখেছে। কলকাতার দর্শকরা ফুটবল খেলা দেখতে কি রকম ভালবাসে, এর থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গতবারের মত এবারও প্রথম ডিভিশন লীগে ১৪টি দলকে খেলতে দেখা যাচ্ছে। গতবারের ১৪টি দলের মধ্যে কালীঘাট ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গেছে। তার বদলে দ্বিতীয় ডিভিশন-চ্যাম্পিয়ান হাওড়া ইউনিয়নকে খেলতে দেখা গেছে। তবে আগেও এই টীমকে প্রথম ডিভিশন লীগে দেখতে পাওয়া গেছল। ১৯৪৩ সালে হাওড়া ইউনিয়ন দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যায়। দীর্ঘ ১৪ বছর পর আবার তারা প্রথম ডিভিশনে তাদের স্থান করে নিয়েছে।

এবারকার ১৪টি টীমের মধ্যে শেষের দিকের তিন-চারটি টীমের কথা বাদ দিলে আর যে কয়টি টীম থাকে তাদের মধ্যে অনেক ভাল খেলোয়াড়ের দেখা পাওয়া গেছে। সেজন্য আশা করা যায় যে-কোন ক্লাবের সঙ্গেই যে-কোন ক্লাব সমানে যুঝতে পারবে। শক্তিশালী ক্লাব বলে যাদের নাম আছে, তাদেরও কোন দুর্ব্বল ক্লাবের কাছে পয়েণ্ট হারাতে হলে আশ্চর্য্যের কিছু হবে না।

কলকাতার বাইরের অনেক নামকরা খেলোয়াড় এখানে জড় হয়েছেন। বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে তাঁদের খেলতে দেখা গেছে। পাকিস্তান থেকেও কিছু কিছু খেলোয়াড়ের আসবার কথা আছে। অতএব আশা করা যাচ্ছে যে এবারকার ফুটবল মরশুম বেশ ভালভাবেই জমে উঠবে।

নূতন ধাঁধা

১। নাম শুনলেই ভয়; কিন্তু চাষের জমিতে তাকে চাই আবার আস্তাবলেও তাকে চাই।

বিজয় ও বসন্ত চৌধুরী—টাটানগর

২। তাকে পান করি, পুকুরে তাকে পাওয়াও যায় কিন্তু পানীয় আকারে পুকুরে থাকে না।

অনিতা সান্যাল—পুরুলিয়া

৩। একটা শব্দ। মানুষের বেলায় প্রযুক্ত হ'লে লোকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু ফল-বিশেষের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'লে সে হয় পরম আদরের। কি?

আশীস, ভানু ও প্রদীপ—খড়্গপুর

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। জাপান—(টোকিও আর কিওটো)।   ২। জোনাকী পোকা।

অঙ্কের ধাঁধার উত্তর—

১। $১=১$

$১-১=০$ ——————(i)

$১^২-১^২=০$

$(১-১)(১+১)=০$ ———(ii)

যেহেতু কি উপরোক্ত (i) এবং (ii) $=০$

$(১-১)(১+১)=(১-১)$

$১+১=১$

$২=১$

$১=২$ (Proved)

২। 215)32250(150
215
1075
1075

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

গুণধর, প্রণব, বিশ্বনাথ ও নিমাই—১৫৬০৩, দুবরাজপুর; আরতি, মিনতি, ভাবি, গণেশ ও দীপ্তি—লক্ষ্ণৌ; খাকা, বুড়ো, সুচিত্রা, বাবা, মা ও নির্ম্মল—১৪৪৭৯, নাগপুর; বিমলদা, রাধাকান্তদা, জিতেন, বিনয় ও আমি—১২৮৬৬, মানুষমুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়; পুলক, জয়া, নন্দা, বুবু, টোকন, টুটু, রিণি ও ভালমাসী—কারোলবাগ, নিউ দিল্লী;

হীরক, ছন্দা, বাবলু, চন্দন, দোলন, ডুডু, শুড়ডুল, লিপি, স্বকু, ধীরা ও রেবা—রাণীগঞ্জ ; কুমারশশী দে—ট্রাঙ্ক রোড, শিলচর ; শ্রীপ্রদীপকুমার ও শ্রীদিলীপকুমার বসু—সেনপাড়া, জলপাইগুড়ি ; দিলীপ, হীরক, শচি, ভন্টু, প্রফুল্ল, অশোক, প্রশান্ত, পীযূষ, ব্রহ্মানন্দ, লেমুড়া ও অরুণ—এন, এন, এম হোষ্টেল, কুচবিহার ; পিন্টু, বুন্টু, নির্ঝর বন্দ্যোপাধ্যায় ইলছোবা মণ্ডলাই, হুগলী ; জীবেন, সুনীল, কুশল, খোকন, কাজল ও প্রতাপ—১৫৬৯৩, মধুবাগান ; ধীরেনদা, মাষ্টারমশাই বৈদ্যনাথ, বিধু, কুলু, দাদা, বন্ধু, ছোটভাই, মুস্তাফা, গণেশ, তপন, বৃন্দাবন, বিহারী ও আমি—নরসিংগর, ধলভূমগড় রতন গাঙ্গুলী—আরমাপুর ষ্টেট্, কানপুর ; রণবীর, সুনীল, বিজয়, দিদি, বৌদি, কটু, সদা, হাবুল, বাসনাদি ও র... করিমগঞ্জ, কাছাড় ; মালা, বাবলু ও ইতুন মুখোপাধ্যায়—ন-পাড়া, বারাসাত, ২৪-পরগণা ; নুরুল, রেণু, চেনু, সা... ম —পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ; মুকুল, বকুল, নুরুল, খোঁড়া, বম, মামা, কুদ্দুস ও মাণিক—পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ; নিমাইচন্দ্র দাস—নলডাঙ্গা,- হুগলী ; তপতী, অসীম, অজিত, জগদীশ, সবেধন, কাজল, কমলা, টুটুল, গৌতম, স্বপন, তপন বিষ্ণু সেনগুপ্ত—মুন্সীরহাট, হাওড়া ; পুলক, রেখা, দীপক, গৌরী, রত্না, শংকর, মাধব ও অঞ্জলিদি—মতিলাল কলোনী, দমদম ; মানু, লক্ষ্মী ও তাপস ; অশোক, মীনা ও দিলীপকুমার বসু—আলীপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি ; হীরক ঘোষ—আলীপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি ; মুরারী, জালাল ও মমু—১৩০৫২, বরাবাজার, পুরুলিয়া ; শ্রীবিমলেন্দু দাস চৌধুরী—বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, ডিগবয় ; রাণা, মিলন, শ্যামল, তপন, কৃপাসিন্ধু, মনোমোহন, সুধাংশু ও কৃষ্ণপদ—দেওয়ান পিয়ার্সন স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ; রীণা, মা ও অনন্তকুমার ভাদুড়ী—১১০৩১, চাঁনপাটিয়া, চাম্পারণ ; বাবলা, বেবী, বিকাশ, বিপুল, পাপু ও বিজন—মহিপুর, দিনাজপুর ; প্রবীর, সমীর, জতী, খুকু, মিনু, লঙ্কা, উচ্ছে ও বেগুন—বাটানগর, ২৪ পরগণা ; খোকন, নারায়ণ, বাবুন ও রত্না—আলীপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; শ্রীবাদল দাশ, নারায়ণ, রত্না, খুকু, ডলি, মিলনদা ও ঝর্ণা—বাবুপাড়া, আলীপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; আমি, সোনাদি, দিদি, অলক, বাবা, মা ও কাকা—আলীপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; বিভা, মিনু, বুদ্ধ, সন্ধ্যা, কানু ও আমি—১২৮৬৩, কুমিল্লা ; সত্যব্রত মজুমদার—অশোকনগর, হাবড়া ; মা, বাবা, দিদি, দাদা, ডুডু, পণ্টু, কেষ্ট, বুড়ি ও মুন্না—কুণ্ডুপুকুর, বর্দ্ধমান আলোকণা, অশোককুমার ও সরযুবালা ঘোষ, কমলা, অন্নপূর্ণা, বিনতা ও অনিতা গোস্বামী—সীতাবল্ডী, নাগপুর সুপ্রিয় চৌধুরী ও কেয়া সেন—কেয়াকুঞ্জ, মধুপুর, পুরুলিয়া ; মঞ্জু, মামণি, বাবা, মাসিমা, দিপু—ব্যানার্জ্জীপাড়া, শ্যামনগর ; স্বপন, সন্তোষ, তপন, পার্থ, অপূর্ব্ব, নীহার, আণ্টু, সুকেশ, বিশ্বরূপ, দীনেন, সত্য ও জীবনদা—গোরা বাজার বাগানপাড়া, মুর্শিদাবাদ ; শ্রীশংকরকুমার কয়াল—১৩৮৪৬ ; তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ—ভদ্রেশ্বর ; কাজল ও সজলকুমার দেব—রামদাঝপেট, নাগপুর ; বাবুল, সদা ও ছুটি—নিউগেট্ ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী ; নিরালা ও কেডা—আলীপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি ; অশোক, রূপক, অলোক, নূপুর, আল্পনা, মা মণি, অজিত, পোটি ও বাচ্চু ভট্টাচার্য্য—আলীপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি ; দিলীপ, প্রদীপ, বিজন, ধরিচাঁদ, স্বপন, নারু, বেবী, রুবি, টুলটুল, উমা, মৃণাল, শান্তনু, খুকী, বুড়ী, খোকন ও ছোটন চক্রবর্ত্তী—আলীপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি ; চিত্রভানু, অপর্ণা ও অল্পনা ঘোষ ; বরুণকুমার ভট্টাচার্য্য—১৫৪৬৪, দাঁতন, মেদিনীপুর ; জগদীশ, জুতি, নিখিল, কল্যাণী, মীরা ও কার্ত্তিক—মিশনপাড়া, ডিগবয় ; চন্দন ও কাজল—মহুলবেড়া, জামশেদপুর ; বুজু, শম্ভু, মঞ্জু, খুকু, শ্যামল, উজ্জ্বল ও শ্রীমন্ত—চাইবাসা গান্ধিটোলা, সিংভূম ; খোকা, নীনা, মধু ও অশোক দাদা—ভুবনবাড়ারী কোলিয়ারী ; চক্রবর্ত্তী দিলীপকুমার—এ. পি. ডি. জে., জলপাইগুড়ি ; অমর, অমিত ও অনক—১৩৪১৫, তালতলা এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ; শ্রীচণ্ডী গোস্বামী—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ; বিরিঞ্চি, সুভাষ, ফকির, সাহেব, মায়াপদ, দেবু, হর, সিদ্ধেশ্বর, অমিয়, প্রবোধ, সনাতন, বগলা, দলু, আমি ও প্রমথ দা—ভীমারডাঙ্গা, বাঁকুড়া ; জাহানারা, রওসনারা, মবির, সাত্তার, মণি, বাবুল, দোস্ত মোহাম্মদ ও সাইনুদ্দিন—চুপসা, বর্দ্ধমান ; টুকু, সাথী, হকি ও বুবু—ধোরি কোলিয়ারী, বেরমো ; গিরিজা, মৃণাল, রাধু ও আমি—করোলবাগ, নিউ দিল্লী ; তপন চট্টোপাধ্যায়—১০১৯৪, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান ; শ্যামাকান্ত, উমাকান্ত, অরুণ, নিশীথ ও মা—কটন সার্কাস, নিউ দিল্লী ; মিণাক্ষী, মঞ্জু, মিনতি, মাধব ও মা—তালপুকুর রোড, কলিকাতা ; ছন্দা, নন্দা ও সুবু—ট্রাঙ্ক রোড, শিলচর ; নাজির লেন ষ্টুডেন্টস্ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ—কলিকাতা-২৩ ; নিমাই সরকার, টোকন ও শিপ্রা সরকার—ডিসেরগড়, বর্দ্ধমান ; হীরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু—আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি ; বাসন্তী, গৌরী, ছবি, লাজু, অনিল, মিনু, ষষ্ট, শুক্লা, বাপি, পিপি, লাভ্‌লি, রবীন্দ্র, অশোক, অরুণ, টুনিমামা, মা, মাসি ইত্যাদি—কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ ঝুপা, পরাণ, দামু, রবু, কৃষ্ণা, স্বপ্না, শঙ্করী ও আমি—পানিহাটী ; প্রদীপ চৌধুরী—১২৮৬০, গরুমহিষাণী, ময়ূরভঞ্জ মীনা, গৌরী, মন, সুব্রত, তাপস, রতন, শেখর, প্রবীর, পলি ও বাঁকা—নারিকেলডাঙ্গা রেল কলোনী ; তাতা, মা মণি, বড়দা, মেজদা, দিদিভাই, মানু, বাচ্চু, ঝুনু, বিশু, কুলু, চিতু, মিতু ও রুনু—জে, রোড, জামসেদপুর ; জ্যোতি, বুবু, সমু,

শরৎ, বাবু, কৃষ্ণা ও কণা—খড়্গপুর ; রমেশচন্দ্র শী—ইমার্জেন্সী কলোনী, কাটিহার ; সলিলকুমার ও শেখরকুমার সেন, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা ; নিরাপদ ও রণজিত চট্টরাজ—মিঠাপুকুর, বর্দ্ধমান ; শ্রীসমীরকুমার কুণ্ডু—বেড়, বর্দ্ধমান ; ভাস্করজ্যোতি সেনগুপ্ত—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; অরিজিৎ, অভ্রিজিৎ, অমিতাভ, অসীমাভ, শুভাশিস. সুকৃৎ ও অভিজিৎ ঘোষ—১৪৯৭১, ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা ; শ্রীশান্তনুকুমার ঘোষ—১৫৩৮২ ; বড়দা, মেজদা, আমি, গনু মাষ্টার, বনা, আশা, পিতু, লালু, পারুল, বৌদি, কাতু, নীলু, অনিল, সুনীল, নিখিল, বাবা ও মা—১০৪১৮, গোষ্ঠ ভবন, পুরুলিয়া ; বিশ্বনাথ, অবনী, কালিকিঙ্কর, গৌর, চঞ্চল ও সুকৃতি—১৪২১৯, মধুপুর, হুগলী ; আব্দুস সালাম খান—১২৮৫৭, হকিকৎপুর এস্, পি ; স্বপ্না কুমার—বি, কে, পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫ ; শ্রীনীরেন লস্কর—শ্রীঅপূর্ব্ব—দেউলভিড়া, বাঁকুড়া ; সুপ্রভাত, রবীন্দ্র, নারায়ণ, মদন, প্রতাপ, বিমান, দীলিপ ও নীতিশ—ঝাপড়দহ হাই স্কুল, হাওড়া ; সুলেখা বসু রায়—১৪২২০, যাদবপুর ; ললিতমোহন মণ্ডল—১২২৮৭, বলরামপুর, হাওড়া ; আরতি, খোকা, মিনতি, দীপ্তি ও গণেশ—রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান ; বিমল, জ্যোতি, বিল্টু, শিবু ও নিখিল—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ; মনোমোহন দাশ ও অশোককুমার ব্যানার্জ্জী—জংগীপুর ; অতুলেশ, জয়তি, মিনতি, ভারতী ও ব্রততী নন্দী—১১৩৯৯, বর্দ্ধমান ; দিবাকর, দ্বিজপদ, দুর্গাদাস, মুকুল, শক্তিপদ প্রভৃতি—এস্, আর, বি, পি, হাইস্কুল, মুরাডি, পুরুলিয়া ; লতিকা, ললিতা, সুষমা, বেলা, রণজিৎ, শিবাণী, রঘুনাথ, স্বপন, দুলাল, মণ্টু, গায়িত্রী—নংপুর, বর্দ্ধমান ; মণিকা, সুশীল ও বিথীকা কুণ্ডু, —বর্দ্ধমান ; বিশ্বনাথ মদ্দনে (ফাগু) ও অজিতকুমার মদ্দনে (ভাদু)—বর্দ্ধমান ; মানস, রমানাথ, বসন্ত, হাবল, সন্তোষ, নবশ্যামল, অজিতকুমার, প্রিয়নাথ, ক্ষিতি, বৃন্দাবন, শক্তিধর, চিত্রেশ্বর—মলবক্ষী ভারতী লাইব্রেরী ; কণিকা, প্রদীপ, দেব ও অপূর্ব্ব দত্ত—তিনসুকিয়া চাঁদমারী ; রেণু, বেণু, রত্না ও রীতা—১২২০২ ; উজু, বিজু, দয়ু, দুলাল, প্রণবকুমার, রঘুনন্দন—মৌতড় ; মধুমঙ্গল, প্রদীপ, দীপক ও বিজন—আলিপুরদুয়ার জংশন ; দিলীপকুমার ত্রিবেদী—ঝাগরাখান্দ কোলিয়ারী, সুরগুজা ; আশু, শত্তকর ও সুধীর—১১৭৪৫ ; ধনঞ্জয় বিশ্বাস ; অলককুমার ভদ্র ও বীরপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কাউট ভাইগণ—জলপাইগুড়ি ; বাপী, সেণ্টু, মঞ্জু, দীপু, অলু, নিনি ও দুলাল—ডিমডিমা চা বাগান ; দীপককুমার ভদ্র, বরেন্দ্র ও রণেন্দ্রনাথ—ডিমডিমা চা বাগান ; সুচিত্রা চৌধুরী—১৩৫৮২ ; শ্রীদিলীপ চৌধুরী—মধুপুর ; সুদেব, চতুর্ভুজ, ভৈরব, পাগল, তিনকড়ি প্রভৃতি—বিণাপাণি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, ১৪৪৮৫ ; ইরেশ ভট্টাচার্য্য—১৩৮৬৯, চাঁদক্ষীরা, কাছাড় ; ইলা, পুতুল, খুকী, বুড়ী, রূপী ও চণ্ডী ঘোষ—মধুপুর ; বিপ্লব দত্ত ও মিনতী দত্ত—জে, কে, নগর ; দ্বিজেন, গোলক, মণি, গোপাল, রবীন ও নীরেন—পড়িরা ; মঞ্জু, ঝণ্টু, বাদল, ভুটু, বিষ্ণু, খোকা, খুকু, মাটা, টুলু, সন্ধ্যা, গীতা ও বাচ্চু ; রণজিৎ, অজিত, বিজলী ও স্বপনকুমার—বাদামপাহাড় ; ছবি, লাবজু, অশোক, অরুণ, কালীপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, অর্চ্চনা, শিবানী, শম্ভু ও কমল—হিলি ; মীরা, সতী, গীতা বিশ্বাস—রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ; অমল দাস—মকদুমপুর, মালদা ; কিরীটি মাহাত—১৫৪৯৮ ; পাণ্ডুয়া পোষ্টাল ষ্টাফ—পাণ্ডুয়া ; জ্যোৎস্না, জ্যোতিকণা, হেনা ও রেণুকা—রাঁচী ; ছোড়দি, আলু, কুতু, ইতু, সুকুদা ও আমি—বোকারো ; বীথিকা, মাধুরী, গীতা, অলক, ডলি, পাবক, বাণী, প্রতিমা, কল্যাণী, অসীমা, নির্ম্মলেন্দু, বাবা ও মা—বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া ; কুমারী অনিতা চক্রবর্ত্তী—শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান ; জয়ন্ত ও পূর্ণিমা দাসগুপ্ত—বর্দ্ধমান ; খোকন, নারায়ণ, রত্না, ঝরণা ও ঠামা—আলিপুরদুয়ার ; সমর, পান্নু, কৃষ্ণ, অঞ্জু, কুশল, অমল ও বাণী—ডিমডিমা ; যুগল, রমেশ, দীপক, টুলু ও রত্না—১৪৬৫৫, বরাবাজার, পুরুলিয়া ; সতীপ্রসাদ দত্ত—পাটনাবাজার, মেদিনীপুর ; অমল বোস—১২৩৯৮, গোপালপুর চা বাগান ; পরমানন্দ ব্যানার্জ্জী—১০৫৫১ ; সনৎ, সমীরণ, অসিতবরণ, নিখিল, তরুণ ইত্যাদি—এম, ভি, স্কুল, পুরুলিয়া ; শক্তি, অঞ্জলি, শ্রীরাম দে—ডাক্তার লেন, কলিকাতা ; নিতাই, হাবুল, শ্যামল, জগা, বিষ্ণু, বলাই, উৎপল প্রভৃতি—পানিহাটী ; অশোক, অরুণ, প্রত্যূষ, ডাকু, রবীন্দ্র, গৌরী, ডলি, মিনু, বাসন্তী, অনিল, টুনিমামা ও নবজাতক—কলিকাতা-২৬ ; অঞ্জুশ্রী ঘোষ—১৩০৩৫, কলিকাতা-২৭ ; অমিতা, আশিস, দিলীপ ও তরুণ দা—১২০৫৪, বহরমপুর ; নিখিল, বিশুদা, নারাণদা ও দিদি—সোদপুর ; দীপনারায়ণ সাউ—ডোমজুড় ; অসিতকুমার কর—১৫৭৭০ ; বন্দনা, বিমান, নিতু ও তুফান—১৫০৬৩ ; বাবলা, সুজা, খুকু, ছন্দা—আসানসোল ; জয়া দাস—১৫৪৫৬, বিলাসীপারা ; যুগল ও শতদল—বিষ্ণুপুর ; জ্যোতিপ্রকাশ, সৌমেন্দ্র, অশোকা ও শরৎ—খড়্গপুর ; সুজিত বিশ্বাস—সুখরিয়া ; মঞ্জুশ্রী, বিমান, শ্রীমান, স্বপ্নাশ্রী—আসানসোল ; নলিনী চক্রবর্ত্তী—বহুবাজার, কলিকাতা ; বাচ্চু, দিপক, লজু, মনোজ—আলিপুরদুয়ার জংশন ; কবিতা, শান্তি, কাঞ্চন, অঞ্জন, ইন্দিরা ও তুহিন—বর্দ্ধমান ; বিশু, অনু ও টুটু—কুমিল্লা।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্।

আজকে তোমাদের কাছে একটা কাজের কথা বলবো। তোমরা সবাই স্কুলে পড়ছো, তোমাদের সকলের ইচ্ছে বি-এ, এম-এ পাস করে কিংবা স্কুল-ফাইন্যাল পাস করে চাকরী করবে, টাকা রোজগার করবে। আজ আমাদের ঘরে ঘরে এই রকম দুরবস্থা হয়েছে যে মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছেন চাকরী করবেন বলে, উপার্জ্জন করবেন বলে।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, আজ আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা কি ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লেখাপড়া শিখে, চাকরীর অভাবে বেকার হয়ে হাজার হাজার ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, বি-এ না এম-এ পাস করা কোন ছেলে চাকরী না পেয়ে রিক্সা টানতে গিয়েছিলেন। হাজার হাজার বি-এ পাস করা ছেলে চাকরীর অভাবে বসে আছেন। এটা হলো আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী। এই বেকার-সমস্যা দূর করবার জন্যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট প্ল্যান করে বড় বড় কারখানা তৈরী করছেন, নানা রকমের নতুন নতুন কাজ গড়ে তুলছেন, যাতে বেকার লোকদের চাকরীর সংস্থান হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি এই বিরাট সংখ্যার বেকারদের চাকরীর সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে প্রত্যেক বছরে বেকারদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে ঘরে ঘরে জাতির দুঃখও বেড়ে চলেছে।

এই সমস্যার প্রতীকার কি, তা আমি জানি না, সেকথা এখানে তোমাদের বলতে আসি নি। গভর্ণমেণ্ট ছাড়া এই বিরাট সমস্যা আর কেউ দূর করতে পারে না। তবে এই সম্পর্কে দু'একটা কথা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, যে কথা কেউ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন তোমরা এখন ছোট, চাকরীর কথা ভাববার সময় এখন তোমাদের নয়। কিন্তু এমন দিনকাল পড়েছে যে, ছোট বলে এই আলোচনা থেকে তোমাদের সরিয়ে রাখলে চলবে না।

আমার কি মনে হয় জান? বেকার-সমস্যা দূর করতে হলে, নতুন নতুন চাকরীর ব্যবস্থা করা দরকার, সেটা খুব সত্যি কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার আমাদের পড়ুয়াদের, আমাদের ছাত্রদের, মনের ভাবনার গড়নকেও নতুন করে তৈরী করা। যেদিন বাঙালী ইংরেজী লেখাপড়া শিখে ইংরেজের দফতরে চাকরী পেতে লাগলো, সেদিন থেকে প্রত্যেক বাঙালীর মনে একটা ধারণা জন্মে যায়, একটা আশা জন্মে, লেখাপড়া শিখে সে ডেপুটী হবে, কিংবা কোন ভাল চাকরী পাবে, না হয় কেরাণী হবে। আজও পর্যন্ত প্রত্যেক বাঙালী পড়ুয়ার মনে সেই ধারণাই কাজ করছে, সেই আশাই তাকে একটার পর একটা পাস করিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ধারণা আজ সজ্ঞানে তাকে বদলাতে হবে। এই ধারণা বাঙালীর মনে চাকরী করাকে এত বড় করে তুলে ধরেছে যে

বাঙালী ছেলেরা টাকা রোজগার করবার আর কোন পথ সহজে ভাবতে চায় না, চাকরী না পেলে তখন বাধ্য হয়ে যাহোক-অন্য একটা কিছু করা যাবে, এই তারা ভাবে। এর ফলে হয়েছে কি, টাকা রোজগার করবার অন্য যে সব পথ, সে সম্বন্ধে আমরা কোন initiative নিতে চাই না। এই initiative-এর অভাব আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মস্তবড় দুর্ব্বলতা। চেয়ারে বসে চাকরী করার এই নেশার ফলে, আজ বাংলাদেশে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ভারতের আর কোন প্রদেশে তা দেখা যায় না।

আজ বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা এসে কায়িক শ্রমের অধিকাংশ কাজই করছে, ছোট কাজ বলে বাঙালী তা থেকে সরে এসেছে। রাস্তায় জল দেওয়া থেকে আরম্ভ করে রিক্‌সাটানা পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ কায়িক শ্রমের কাজ বাঙলা দেশে অ-বাঙালীরা করেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশে আজ খাবারের ভাল দোকান অধিকাংশ অবাঙালীদের, বাংলাদেশে বাঙালী গয়লা প্রায় অদৃশ্য হয়ে আসছে, এমন কি বাংলাদেশে আজ বাঙালী পুরোহিতও দুর্লভ হয়ে আসছে···গ্রামে গ্রামে আজ উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণেরা বাঙালীর পুরোহিত-গিরি করছেন। ছোট কাজ মনে করে বাঙালী এই সব কাজ থেকে সরে এসেছে।

এ থেকে মনে করো না যে আমি অবাঙালীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইছি, কিংবা বলতে চাইছি যে বাংলাদেশে বাঙালী ছেলেরা রিক্‌সা টানলেই বাংলা দেশের দুর্দ্দশা ঘুচে যেতো। এই দৃষ্টান্ত দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, কাজ বা চাকরী সম্বন্ধে বাঙালীর মনের গড়নের ধারা কি রকম, সেটা বোঝাবার জন্যে।

কাজ সম্বন্ধে আজ বাঙালী ছেলের মনের ধারণা বদলাতে হবে। কাজ করা আর চাকরী করা এক জিনিস নয়। প্রত্যেক লোককে কাজ করতে হবে, প্রত্যেক লোক চাকরী নাও করতে পারে। কাজ না করে চুপ করে বসে থাকাকে জাতীয় পাপ মনে করতে হবে। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে ভাবতে হবে, আমাকে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, আজ যদি আমি একটা পিয়নের কাজ পাই, তাই করবো, কিন্তু এই ভেবেই করবো চিরকাল আমি পিয়নই হয়ে থাকবো না। পিয়নের কাজ করতে করতে আমি উন্নততর আর কোন কাজের জন্যে নিজেকে তৈরী করে তুলবো। সব কাজের পেছনে এই মনোভাব থাকা দরকার। আমি এক কাজ থেকে আর এক কাজে নিজের যোগ্যতায় এগিয়ে চলবো, অবসরে নিজেকে সেই নতুনতর কাজের উপযুক্ত করে তুলবো। পিয়ন হতে হয়েছে বলে পিয়ন হয়েই থাকবো না। যদি তোমার এই মনোভাব থাকে, যদি তোমার অবসরকে নতুন শিক্ষায় নতুন পরিশ্রমে সার্থক করে তোলবার আগ্রহ ও চেষ্টা থাকে, কেউ তোমায় সখ আটকে রাখতে পারবে না।

একটা তুলনা দেই। বিলেতে আমি জানি, বহু ছেলে কম্পোজিটরের কাজ

করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশেও বহু ছেলে কম্পোজিটরের কাজ করেন। তফাৎ হলো সেই মনোভাবের। আমাদের দেশে, আমি দেখেছি, প্রত্যেক ছেলে বা লোক যিনি কম্পোজিটরের কাজ করেন, কম্পোজিটরের টুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরে নেন, আজীবন কম্পোজিটরী করবার জন্যেই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে দু'চার মাস কম্পোজিটরী কাজ করে ছোট কাজ ভেবে ছেড়ে দেন। ওদের দেশে দেখেছি, যে ছেলে কম্পোজিটরী করতে এলেন, প্রাণ মন দিয়ে কম্পোজিটরীর কাজ করতে লাগলেন, কিন্তু দৃষ্টি রইলো কবে কম্পোজিটরের টুল ছেড়ে সেই কাগজের লেখকের টুলে গিয়ে বসবেন...এবং তার জন্যে কাজের অবসরে, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে, রাত জেগে বই পড়ে, লিখে, নিজেকে তৈরী করে চলেন। এই দুটো মনোভাবের তফাৎ, প্রচণ্ড তফাৎ।

কিছুদিন আগে তোমরা খবরের কাগজে একটা সংবাদ হয়ত লক্ষ্য করেছ, একজন বাঙ্গালী ডক্টর অব্ ফিলসফী লণ্ডনে পিয়নের কাজ করছিলেন। আমি তাঁকে বিশেষভাবে চিনি। তাঁর নাম ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল, আমার যুগে তাঁর মতন বিদ্বান ছেলে, কৃতী ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। তিনি একজন সত্যিকারের বড় সাহিত্যিক। প্রথম যৌবনেই তিনি য়ুরোপে চলে যান এবং পোলাণ্ড আর রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলিস্ আর রাশিয়ান ভাষায় গবেষণা করেন। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক চেখভের ওপর রুষভাষার থিসিস্ লিখে তিনি ডক্টোরেট পান এবং পোলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

ভারত স্বাধীন হলে তিনি রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসে বড় চাকরীও পান, কিন্তু যে কোন কারণে হোক ভারত-সরকারের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় তিনি অত্যন্ত চাকরী ছেড়ে দেন এবং রাশিয়া ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন, সঙ্গে তাঁর পোলিস্ স্ত্রী ও পুত্র। হাতে পয়সা-কড়ি নেই! লণ্ডন শহরে চুপ করে বেকার হয়ে বসে থাকা যায় না। সন্ধান নিতে নিতে খবর পেলেন, পোষ্ট-অফিসে পিওনের একটা চাকরী পাওয়া যেতে পারে। সেই পিওনের কাজই গ্রহণ করলেন। য়ুরোপের ছ'সাতটা ভাষায় যিনি সাহিত্য-রচনা করতে পারেন, তিনি সেই সামান্য চিঠি-বিলি-করা পিওনের কাজ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। কিন্তু সে-কাজ তাঁকে বেশী দিন করতে হলো না। আজ তিনি আবার ভারতবর্ষেই আর একটা কাজ পেয়েছেন, আসামের পার্ব্বত্য জাতিদের ভাষা শিখে তার অভিধান তৈরী করছেন, পার্ব্বত্য-জাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। এই হলো সত্যিকারের আধুনিক মানুষের মনোবৃত্তি, যা য়ুরোপীয় সভ্য জাতিদের মধ্যে দেখা যায়। স্বদেশিয়ানার মিথ্যা বড়াই ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে এই মনোবৃত্তি আমাদের শিখতে হবে। এই মনোবৃত্তি যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি, তবেই এই অর্থনৈতিক সংগ্রামে বাঁচবো! আজ এই পর্য্যন্ত। জয় হিন্দ্

—দাদুমণি

অগ্নিবৃষ্টি—এতদিন জানা ছিল, আগুনই জলের প্রতিষেধক। কিন্তু গত ৭ই মে সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে যে, ২৮শে এপ্রিল থাইল্যাণ্ডের একটি পাঁচ বছরের বালিকার গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যায়। পরে হাসপাতালে বালিকাটির মৃত্যু হয়। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, ঐ বৃষ্টির জল কোন কারণে রেডিও-অ্যাক্টিভ হয়ে গেছল।

হলুদবর্ণের বারিপাত—খবর পাওয়া গেল সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে পীতবর্ণের বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের জামা-কাপড় রঙিন হয়ে যাচ্ছে। খ্রীস্টমাস দ্বীপে ব্রিটেনের হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ হওয়ার দরুণ তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশিই এই পীতবর্ণ বারিবিন্দু সৃষ্টি করেছে, অনেকে এইরূপ ধারণা করছেন।

পশ্চিম বাংলায় দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ আবার তার কালরূপ নিয়ে বাংলাদেশে অবতীর্ণ হয়েছে। লোকে ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছে। এমন খবরও পাওয়া গেছে, চোর বাড়ীতে চুরি করতে এসে রান্না ভাত নিয়ে পলায়ন করেছে। সরকার লঙ্গরখানা খুলে দুর্গত জনতাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন।

হাসপাতালে দুর্নীতি—খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেদিন মেডিক্যাল কলেজে ছদ্মবেশে গিয়ে হাতেনাতে রুগীদের জন্যে দেওয়া দুধ চুরি ধরে ফেলেন। কয়েক বছর যাবৎ হাসপাতাল থেকে দুধ, মাছ, ওষুধ আর খাবার চুরির কথা আমরা প্রায়ই শুনে আসছি। দুর্গত রুগীদের প্রতি যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নজর দেন, তাহলে দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞই হবে।

এ যুগের রবার্ট ব্রুশ—এক সংবাদে প্রকাশ কৃষ্ণনগর থানার দুর্গাপুর গ্রামের বৃদ্ধ রসিকলাল এ বছরও যথানিয়মে জামাতার সঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে আসেন। এবার নিয়ে তাঁর পনেরো বার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়া হল। গত বছর তাঁর ভাইপোর সঙ্গে তিনি পরীক্ষা দেন। ভাইপো পাস করে, তিনি ফেল করেন। তাঁর অধ্যবসায় রবার্ট ব্রুশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়!

অদ্ভুত উত্তর—আমাদের দেশে চাকুরীর মধ্যে আই. এ. এস্. বা আই. এস. পি. হওয়া একটি কামনার বিষয়। কিন্তু ছাত্রেরা সেই আই. এ. এস. বা আই. এস. পি. পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের নিম্নলিখিত কৌতূহলোদ্দীপক উত্তর দিয়েছে—

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—চীন প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান। মহাত্মা গান্ধী—সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মানুষ। ভিটামিন্স—ভিয়েৎনামের অধিবাসী বৃন্দ। ব্লু ব্লাড—সমুদ্রের জল অথবা অপরাধী বিবেক। ডেড সী—প্রশান্ত মহাসাগর, অতলান্তিক মহাসাগর।

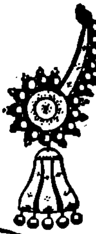

শ্রীবিষ্ণু জুয়েলারী

গেজেটেড স্বর্ণশিল্পী

১২৫ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

টেলি : বিদ্যাসেবা — পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মূলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপা কালি ইত্যাদি
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪।৩৫, „ „ „
৬৪ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা — ফোন নং : বড়বাজার, ৩৪-১০২০

মফস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক